সপ্তম অধ্যায়
সৃজনাত্মক রচনায় রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার প্রকাশ
কবিতা

গদ্য রচনায় গল্পে নাটকে চরিত্র হিসেবে নারীর ব্যক্তি স্বরূপের যে বৈচিত্র্য বাস্তব জীবন সমস্যার যে রূপ ফুটে ওঠে কবিতায় ঠিক সেইভাবে তা আসে না। কবিতার ভাষা মাধ্যম পৃথক। ভাব ভাষা ব্যঞ্জনা বচনের অনির্বচনীয়তা কবিতায় রহস্যলোক সৃষ্টি করে। গদ্য ভাষায় বাস্তব জীবন-সমস্যা যে যুক্তিক্রম মেনে চলে কবিতার তা অনেকটাই অনুল্লেখিত থাকে। কবিতায় নারী আসে প্রধানত রহস্যময়ী হয়ে। অপার সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবী কবির কাছে 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' পুরুষের মনে নারীকে ঘিরে আছে এক বিশেষ অনুভূতি। তার রয়েছে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আর্কষণ, তার প্রয়োজন নারীর কল্যাণী রূপের মাধুর্য, রয়েছে নারীর প্রেয়সী রূপের প্রতি মুগ্ধতা, পুরুষকে প্রেরণা দেবার অমোঘ শক্তি রয়েছে নারীর মধ্যে এই সব ধারণা ও বিশ্বাস আমূল প্রোথিত হয়ে আছে পুরুষের মনে। পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর এই পরিচয় মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। তেমনি অস্বীকার করা যাবে না পুরুষের চোখে নারীর মোহনীয় হয়ে ওঠার নিজস্ব আকাঙক্ষাকে। নর নারীর প্রেমের অনিবার্যতা এবং মধু-মুহূর্তগুলি ভাষার মাধুর্যে ভাবের ব্যঞ্জনায় কবিতার চিরন্তন সম্পদ হয়ে আছে। এই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তব জগতের নারী। যে চিরকাল কল্পনার সামগ্রী হয়ে শিল্প-সাহিত্যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তার নিজের বাস্তব জীবনে সত্যিকারের পরিচয়টা কি? সে দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রচুর কবিতা থেকে কয়েকটি নির্বাচন করে নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে।

মানসী কাব্যের (১৮৯০) 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' কবিতা দুটোয় রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার পরিচয় আছে। পুরুষের একটা প্রিয় ধারণা হল নারীর জীবন কেবলমাত্র পুরুষকে ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই সার্থক। রবীন্দ্রনাথ ও তেমন ভাবতেন স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ এই ভালোবাসায়। কিন্তু তিনি একথাও জানেন যে পুরুষের ভালোবাসার মধ্যে অপমানও লুকিয়ে থাকতে পারে ঃ

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ - মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?[১]

আধুনিক নারী প্রেম আর সোহাগের মধ্যে তফাৎ বুঝতে শিখেছে প্রেমহীন করপরশকে তার অপবিত্র মনে হয়।

মনে কি করেছ, বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।[২]

প্রেমিককে নিয়ে এমন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা সেকালের মেয়েদের কাছে বেশ সাহসের কাজ। কবি মেয়েদের মুখে ধীরে ধীরে আধুনিককালের নারীর উপযোগী ভাষা ব্যবহার করছেন। কিন্তু পুরুষের এত কালের সংস্কারে আঘাত লাগছে, নারী সচেতন হয়ে ওঠায়; বেশ তো ছিল কল্পনার জগতে নারীরা - পুরুষের সেই বেদনাকে প্রকাশ করে বলেছেন ঃ

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে
রহিলে না ধ্যান ধারণায়।[৩]

পুরুষের কল্পনা জগতে সৌন্দর্য মাধুর্যে মন্ডিত মানসী প্রতিমা আর বাস্তব জগতের ঘর গেরস্থালির মানবী এই দুই জনে যে এক নয় এই বোধও কাজ করেছে তাঁর মনে।

এসো থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে
দেবতার তরে থাক্, পুষ্প - অর্ঘ্যভার।[৪]

সোনার তরী (১৯৯৪) কাব্যের 'সোনার বাঁধন' কবিতায় শোনা গেল ভিন্ন সুর। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ রমাবাঈ কৃষ্ণভাবিনীদের নারীমুক্তি ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, মেয়েদের এই পরিবর্তন তাঁর মনে সংশয় সৃষ্টি করেছে। এতদিনে পুরুষের পক্ষ থেকে নারী জীবনের অসামঞ্জস্যগুলি তুলে ধরেছিলেন, এবার মেয়েদের নিজেদের দিক থেকে উদ্যোগ আয়োজন শুরু হতেই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এর পরিণাম কি হবে ভেবে। 'সোনার বাঁধন' কবিতায় দেখিয়েছেন নারী বন্দী ঠিকই কিন্তু সে বন্ধন 'সুমধুর স্নেহের', আর মেয়ে তো সংসারের বোঝা বা দাসী নয় সে হচ্ছে 'গৃহলক্ষ্মী'। কবি নারীর এই বন্ধনকে প্রশংসার চোখে দেখেছেন –

তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে -
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি
দুইটি সোনার গন্ডি, কাঁকন দুখানি।[৫]

গৃহগত প্রাণ বাঙালির কাছে একজন সর্বাঙ্গ সুন্দর নির্ভরযোগ্য গৃহলক্ষ্মী একান্ত কাম্য। এর অন্যথা হলে সমাজের সুস্থিতি নষ্ট হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় ঘুরে ফিরে কল্যাণী জীবপালিনী লক্ষ্মীর প্রতীক হয়ে নারী দেখা দিয়েছে। মেয়েদের প্রধান ভূমিকা গৃহলক্ষ্মীর। তাই রবীন্দ্রনাথের লেখায় মেয়েদের দুখঃ যন্ত্রণা তাদের ওপর সমাজ পরিবারের অত্যাচারের প্রতিবাদ যেমন আছে তমনি আছে কল্যাণী নারীর বন্দনা।

রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায় 'চিত্রা' 'কথা' ও 'ক্ষণিকা' কাব্যে। 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যের 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাটি তাঁর দুই নারী ভাবনার কাব্য রূপ। ''জীবনের অভিজ্ঞতাতেই তিনি হয়তো প্রেয়সী ও সঙ্গিনী নারীর এই দ্বৈত রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন -- তাই তরুণ বয়স থেকেই এটি তাঁর অন্যতম প্রিয় থীম।''[৬] নাটক উপন্যাস ও দুই নারী তত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন। পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন দুই নারী তত্ত্ব তাঁর নিজস্ব মৌলিক ভাবনা না নারীর স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে এর উপাদান। একই মেয়ের মধ্যে দুই রূপ থাকতে পারে আবার তা ভিন্ন ভিন্ন মেয়ের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবেও থাকতে পারে। স্নেহ-মায়া-মমতার মধ্যে ফুটে ওঠে মাতৃরূপের প্রাধান্য; আবার মোহিনী রূপের আকর্ষণে পুরুষকে মুগ্ধ করতে চায় নারী। নারীর সৌন্দর্য মূল্য পায় পুরুষের মুগ্ধতায়। নারীও কামনা করে দীর্ঘায়িত যৌবন। এই ধারণার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে আজকের নারীদের জীবনাচরণে। আধুনিক নারী ধী-র সঙ্গে শ্রী-র চর্চা ও করে থাকে। সৌন্দর্য এবং স্নেহ প্রেম মমতা এ সবই নারীর নিজস্ব সম্পদ। নারীর মধ্যে রয়েছে এই দুই রূপের প্রকাশ। মেয়েদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ কত সূক্ষ্ম ছিল দুই নারী তত্ত্ব তার প্রমাণ। শুধু স্নেহ মমতা দিয়ে সেবা করে নয়, সৌন্দর্য এবং শক্তি দিয়ে পুরুষের যথার্থ সঙ্গিনী হতে চায় নারী।

রবীন্দ্রনাথের দুই নারী তত্ত্বকে কারো মনে হয়েছে যে,''রবীন্দ্র চিন্তায় এ-দু-নারী আদিম, চিরন্তনী, শাশ্বতী; এদের পরিবর্তন নেই, এরা রবীন্দ্রনাথ ও পুরুষতন্ত্রের স্টেরিওটাইপ। তাই নারী চিরকালই থেকে যাবে পৌরাণিক উর্বশী; যে কামনার তৃপ্তি যোগাবে পুরুষের, আর কল্যাণী, যে পুরুষের গৃহকে ক'রে

তুলবে স্বর্গের মত সুখকর। এরা পরস্পরের বিপরীত; উর্বশী রূপসী, সে বেশ্যা, তাকে দেব-দানব আর পুরুষ কেউ গ্রহণ করে নি; আর কল্যাণীকে পুরুষ বন্দী করেছে নিজের গৃহে, নারীর দু - রূপকে পুরুষ ও রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখেছেন, তাতে নারী হয়ে উঠেছে এক শোচনীয় প্রাণী।"[৭] নারীর দুই রূপের অন্য এক বিশ্লেষণ হল, "জননী ও প্রেয়সী--নারীর দুই ধ্যান মূর্তিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনা যদিও চিরকালই উচ্ছ্বসিত, কিন্তু সামাজিক মুখ্য ভূমিকা হিসেবে তাদের কেন্দ্র করে যে সব মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে -- তার ফাঁকির কথা এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলতে শুরু করেছেন।"[৮] মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেয়ে বাইরের জগতে নিজেদের স্থান করে নিতে শুরু করেছিল। ঘর ও বাইরের টানাপোড়েনে তাদের পরিবর্তিত রূপ কেমন দাঁড়াবে তা নিয়ে সংশয় ছিল। গৃহস্থ বাঙালির মনে আশঙ্কা ছিল নব অর্জিত শিক্ষা স্বাধীনতা মেয়েদের গৃহকর্ম বিমুখ করে দেবে না তো? গৃহকে কেন্দ্র করেই সমাজের স্থিতি, সেই স্থিতির জায়গাটাই ধরে আছে সমাজের মেয়েরা। ইংরিজি শিক্ষার প্রভাবে এ দেশের এক শ্রেণীর যুবকেরা বিপথগামী হয়ে সমাজে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল সে অভিজ্ঞতার কথা বাঙালি সমাজ ভোলে নি। সুতরাং নতুন শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত মেয়েদের নিয়ে সমাজ - মানস খুব স্বস্তিতে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নারীর কল্যাণী রূপের প্রশস্তি সে যুগের এক শ্রেণীর মানসিকতার প্রতিফলন। 'ক্ষণিকা'র (১৯০০) 'কল্যাণী' কবিতায় কবি কল্যাণী মানবীকেই তাঁর সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান' তাই উৎসর্গ করেছেন।

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্প কানন মাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।

. . . .

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বর মালা।

. . . .

সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।[৯]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানেই থেমে থাকেন নি। সেই সময়ে বাংলা দেশের সমাজ চিত্রের কথা মনে রাখলে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ভাবনায় স্বতন্ত্র বলেই গৃহলক্ষ্মী কল্যাণী নারীর পাশে সৃষ্টি করেছিলেন'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালের মত মেয়েকে। যে মেয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, 'এ গলির মধ্যকার চার-দিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদবুদ্‌টা এত ভয়ংকর বাধা কেন? . . . ঐ তুচ্ছ ইঁট কাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে।"[১০] এই প্রশ্নের মধ্যেরয়েছে মেয়েদের স্বতন্ত্র মর্যাদার স্বীকৃতি। সুতরাং "যাকে গৃহে গ্রহণ করা হয় নি, সে হয়েছে বেশ্যা -- . . . আর যাকে গ্রহণ করা হয়েছে, সে হয়েছে দাসী।"[১১] রবীন্দ্রনাথের দুই নারী তত্ত্বের এমন সরলীকরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

'কথা (১৯০০) কাব্যের 'স্বামীলাভ' কবিতায় সদ্য বিধবা সহমরণে যেতে চেয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে কবি তুলসীদাসের কাছে। স্বামীকে পেলে সে স্বর্গেও যেতে চায় না, 'স্বামী যদি পাই স্বর্গ দূরে

থাক।'[১২] তুলসীদাস জানালেন বিধবা নারীর জীবন অশুভ অশুচি কিছু নয় সে অন্যভাবে বেঁচে থাকতে পারে। খুঁজে পেতে পারে বেঁচে থাকার অর্থ। ঘরে বন্দী নারীর জীবনে মুক্তির দুটো মাত্র দরজা খোলা ছিল একটা মৃত্যুর দিকে আর একটা ঈশ্বরের দিকে। সামাজিক শাসনকে উপেক্ষা করবার জন্য অথবা আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদে পিঞ্জরাবদ্ধ মেয়েরা বার বার ব্যবহার করেছে মুক্তির এই দুই পথকে। এই কবিতায় কবি মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে দিলেন মৃত্যুমুখী নারীটিকে। রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার বিবর্তন তাঁর কবিতার মধ্যেও ধরা আছে। তাঁর পরিণত বয়সে লেখা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু কবিতা নিয়ে এই ধারাবাহিকতা দেখানো হ'ল। উৎসর্গ কাব্য গ্রন্থের ৩২ ও ৪৫ সংখ্যক কবিতায় নারীর করুণাময়ী মূর্তির বন্দনা আছে। নারী ইচ্ছা করলে 'কবির বিচিত্র গান' কেড়ে নিতে পারে আপন চরণ প্রান্তে; নারী ভুবনের পূজো পায় জেনেও তা উপেক্ষা করে মুগ্ধ চিত্তে মগ্ন হয়ে থাকে 'আপনার গৃহের সংগীতে'। দ্বিতীয় কবিতায় শ্রান্ত বাইরের জগতে উপেক্ষিত অবহেলিত পুরুষ তার বিশ্রান্ত জীবনে আহ্বান জানিয়েছে আনন্দময়ী সুন্দরী সতী তপস্বিনী নারীকে। মধ্য যৌবনে পৌঁছে ও কবি নারীর মধ্যে পেতে চেয়েছিল চিরন্তন কল্যাণীকে।

কিন্তু পুরুষ শুধু নারীর সেবাকে গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করে না, নারীর কল্যাণী রূপের মাধুর্যে মুগ্ধ হয় না, তার মধ্যে ও আছে প্রেম স্নেহ। স্ত্রীকে অবহেলা করে যে পুরুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চায় এ সে জাতের পুরুষ নয়। 'খেয়া' (১৯১০) কাব্যের 'বালিকা বধূ' কবিতায় দেখা যায় বর তার নবীনা বুদ্ধিহীনা বালিকা বধূকে স্নেহে প্রেমে কাছে টেনে নেয়, তার জন্যে সাজিয়ে রাখে রতন আসন সোনার পাত্রে ভরে রাখে 'নন্দনবন - মধু'।'

গীতাঞ্জলি পর্ব পেরিয়ে কবি পৌঁছলেন নতুন বাস্তবতায় এই সময়ে লেখা 'পলাতকা' (১৯১৮) কাব্যে ''নারী সম্বন্ধে কবির নূতন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, . . . রবীন্দ্রনাথের আর কোনো একখানি কাব্যে নারীকে এমন সর্বৈব প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। পলাতকা কাব্য জগতের প্রমীলা রাজ্য।''[১৩] এই কাব্যের 'চিরদিনের দাগা' কবিতার নায়িকা শৈলবালা, 'কালো মেয়ে' কবিতার নন্দরানী অবাঞ্ছিত নারীর প্রতিনিধি। অভিভাবকদের মনে বিয়ে দেবার উদ্বেগ জাগিয়ে সংসারে নিরন্তর অবহেলার পাত্রী হয়ে থাকে। শৈলবালার কোনোরকমে বিয়ে হলেও বরের ঘরে যাবার আগে জাহাজ ডুবে মৃত্যু হয়। নন্দরানীর বিয়ে হয় না কিন্তু তার উপস্থিতিতে এক তরুণের 'ক্লান্ত পরান জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে'। যুবকের মনে প্রেমের সঞ্চার করলেও নন্দরানীর তা অজানা থেকে যায়। 'মুক্তি' কবিতায় বাইশ বছরের গৃহবধূ 'এই টে ভালো, ওই টে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে/ নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে, এতগুলি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। 'দশের ইচ্ছা বোঝাই করা' জীবনটা টেনে টেনে এখানে এসে পৌঁছিয়েছে। ন - বছর বয়সে সংসারে ঢুকে সে জেনেছে 'রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা।' মানুষের জন্য মহাকালের বীণায় বাণী বাজে সে তার কিছুই জানে না। এই ক্ষুদ্র গন্ডীবদ্ধ জীবনে সে জানতেই পারে নি, 'আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা/ কী অর্থে যে ভরা।' বাইশ বছরের জীবন ফুরিয়ে যাবার আগে বৃহৎ বসুন্ধরার তার চেতনায় ধরা পড়েছে বসন্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। যৌবনের ঋতু প্রাণ চঞ্চলতার ঋতু বসন্ত এসে ফিরে গেছে সংসারের কাজে ব্যস্ত মেয়েটি সাড়া দেবার সুযোগ পায় নি। প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভবের মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রকৃতি বৃহতের চেতনাকে অনুভব করতে পারে। সে নিজেও যে ক্ষুদ্র মানব মাত্র নয় এক বিশাল সৃষ্টির কর্মের অংশ, এই বোধ তাকে ক্ষুদ্র গন্ডী থেকে মুক্তি দেয়। রুগ্নতার অবসরে সংসার থেকে বিযুক্ত হয়ে সে আবিষ্কার করে ঃ

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে

বসন্তকালে এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ - পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে উঠছে প্রাণে --
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুরে বেঁধেছে জ্যোৎস্না - বীণার নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।[১৪]

সংসারে লক্ষ্মী বলে খ্যাতিকে নারী জীবনের পরম সার্থকতা মনে করা হোত। সেখান থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নায়িকা নিজেকে আলাদা চোখে দেখতে শিখল, বসুন্ধরাকে জানতে শিখল, নিজের মতো করে জীবনটার একটা অর্থ খুঁজে পেল। এ যেন তার আত্ম পরিচয় লাভ মৃত্যুর আগে সে কথা জানিয়ে গেল অন্যদের। বাঙালি ঘরের বধূ নিজেকে মহীয়সী বলে মর্যাদা দিতে পারল -- হীনাবস্থা থেকে তার আত্মার উত্তরণ ঘটল রবীন্দ্রনাথের হাতে।

'ফাঁকি' কবিতাতে তেইশ বছরের রোগাক্রান্ত বিনু হাওয়া বদলের জন্য সুযোগ পেয়েছে প্রথম ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবার। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে স্বামীকে কখনো তেমন করে পায় নি তাই "বিনুর মনে জাগছে বার বার / নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার;" হঠাৎ পাওয়া খুশিটুকু ছাড়িয়ে দিতে চায় সবার মাঝে তাই ইস্টিশানে অল্প পরিচিত ঝাড়ুদারের স্ত্রীর দুঃখের কথা শুনে তার মেয়ের বিয়ের গয়না দিতে রাজী হয়ে যায়। বিনুর স্বামী যথারীতি হিসেবী স্বামীর মতো মাত্র দু টাকা দিয়ে বিদায় করে আপদ। দু মাস পরে বিনু মারা যায়; যাবার আগে তার সব আবদার পূরণ করেছে স্বামী এই বিশ্বাসে তার দুটো মাস সুধায় ভরে যায়। বিনুকে মিথ্যে বলার জন্য তার স্বামীর অনুশোচনা চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

আমাদের সমাজের ব্যবস্থা এমনই ছিল যে বালবিধবা কন্যাকে ঘরে রেখে প্রৌঢ় পিতার দ্বিতীয় বার বিবাহ অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। "ইহার মধ্যে সমাজ জীবনের যে দুঃখ ও গ্লানি, নারীত্বের যে - অবমাননা, যে নিদারুণ ট্র্যাজেডি আত্মগোপন করিয়া আছে, সচরাচর তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। 'নিষ্কৃতি' কবিতায় কবি সেই গ্লানি ও অবমাননা, দুঃখ ও বেদনা সবিস্তারে সুনিপুণভাবে উদঘাটন করিয়াছেন,"[১৫] কিন্তু কবি এখানেই থেমে থাকেন নি একালের যুবক যুবতীরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাত্যাঘাত করেছে। বাল বিধবা মঞ্জুলী সাহস করে ছোটবেলার খেলা ঘরের সাথী পুলিনকে বিয়ে করে নতুন ঘর বাঁধতে গেছে। বালিকা বধূর একান্ত নির্ভরতা, কল্যাণী নারীর সেবা মাধুর্য দান সেখান থেকে 'মুক্তি'র নায়িকার আত্মপোলব্ধি, মৃত্যুর আগে বিনুর স্বামী-প্রেমের স্বতন্ত্র অনুভূতি মঞ্জুলিকার বিদ্রোহ এই সব চরিত্র ভাবনার মধ্য দিয়ে নারীর ক্রমপরিণতির স্তরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯২৮ -এ প্রকাশিত 'মহুয়া' প্রৌঢ় বয়সের প্রেমের কাব্য বলেই পরিচিত। এই কাব্যের সবলা, প্রতীক্ষা এবং নির্ভর তিনটে কবিতা মিলে একটা ভাবনা বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।"[১৬]

নারীর কণ্ঠে এ কোনো আকুতির ভাষা নয়, নয় প্রার্থনাও। সমাজে নিরন্তর অসমতার মুখোমুখি নারীর অভিজ্ঞতার সুতীক্ষ্ম বাণী রূপ এই কবিতা। সমাজ সংসার ভাগ্য বিধাতা কোনোটারই চেহারা খুব স্পষ্ট

নয়; যা স্পষ্ট তাহল এই সব অদেখা শক্তির কাছে নারী সত্তার অবমাননা তাকে নিঙড়ে ব্যবহার করবার প্রবণতা, নারীর ব্যক্তি সত্তা যথার্থ বিকাশের ধারণা থেকে বহুদূরে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সহানুভূতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য নারীর সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে, দেখেছেন আর্জেন্টিনীয় ভিক্টোরিয়াকে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল নির্দশন এই নারী রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনুভব করেছেন নারীর অন্তরতম সত্তার জাগরণ। প্রেম বিবাহ সংসার কর্মে নারী - চিত্ত সম্পূর্ণতা খুঁজে পাচ্ছে না, কোনো এক অভাব বোধ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করছে ক্ষোভ; তারা পেতে চাইছে জীবনে অন্য কোনো অর্থের সন্ধান। ----

'শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাবো তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা পাশে।'[১৭]

শঙ্কা থেকে ভয় থেকে লজ্জার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে চায়। নিজের মধ্যে অনির্বচনীয় কে সে অনুভব করে, নতুন জেগে ওঠা নারীত্ব স্বীকৃতি চায় পুরুষের। যে পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার সেই পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধির কাছে স্বীকৃতি না পেলে মূল্য যাচাই হবে কি করে। দৃঢ় চেতা নারীর প্রেম ভাবনাকে প্রকাশ করেছে 'সবলা' কবিতা। ''নরনারীর প্রণয় লীলায় নারীর যে মূর্তি কবির ভাব কল্পনায় রূপ লইয়াছে সে-নারী অবশ, নর-নির্ভরা, কামনা-কোমলা, প্রেমাবল্যুণ্ঠিতা নারী নয়; তার প্রণয়ে হীন ভিক্ষাবৃত্তি অথবা দীনাত্মার কাতর আকুলতার স্থান কোথাও নাই। এই প্রণয়-লীলা বলিষ্ঠ সংগ্রাম-তৎপর, সত্য ও সাহস-প্রতিষ্ঠ।''[১৮]

'প্রতীক্ষা কবিতায় কবি অপেক্ষা করে আছেন ঃ

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।[১৯]

নারী ছিল সেবাকারিনী নর্ম সহচরী; পুরুষের আসন ছিল দেবতার, অনাগতা প্রত্যাশিতাকে প্রণামের জন্য এতদিনে প্রস্তুত পুরুষ-চিত্ত। কল্যাণী সতী সুন্দরী বালিকা বধূর ভীরু সলজ্জ পুরুষ নির্ভরতা থেকে জেগেছে যে মহীয়সী নারী বিপুল কর্মের জগতে সে হয়ে উঠুক পুরুষের আত্মার সঙ্গিনী'। তাকে নিয়েই দুরূহ পথে যাত্রা করতে চায় প্রেমিক পুরুষ। 'নির্ভয়' কবিতায় আছে যৌথ জীবনের সেই ছবি। 'পঞ্চ শরের বেদনা মাধুরী দিয়ে বাসর রাত্রি' রচনার মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের ভিত গড়া হবে না; 'দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে' এ প্রেম নিয়োজিত হবে। কোনো 'মোহন-মরীচিকা'র পিছনে না ঘুরে পরস্পরকে জেনে শ্রদ্ধা করে সার্থক যুগল প্রেমের কল্পনা করেছেন কবি ঃ

ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে --
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী
তুমি আছ, আমি আছি।[২০]

পুনশ্চ (১৩৩৯) কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় বাঙালি ঘরের অতি সাধারণ একটি মেয়ের অ-সাধারণ হয়ে ওঠার আকাঙক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। তাকে অ-সাধারণ করে দেবার জন্য আর্জি জানিয়েছে শরৎবাবুর কাছে। শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় বাঙালি ঘরের অনাদৃত সাধারণ মেয়েদের কাহিনীকে করুণ রসে

জারিত করে অ-সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে মেয়েরা এক ধরণের মহিমান্বিত রূপ লাভ করেছে। শরৎচন্দ্র সমাজের রীতি-নীতি সংস্কার প্রভৃতির সমালোচনা করে, প্রেমের বিশ্লেষণ করে নারীর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন; তাঁর সহানুভূতি ও দরদ জনমানসে তীব্র ভাবাবেগের সৃষ্টি করেছিল। তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন নারী দরদী হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা অনেক গভীর বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং সুদূর প্রসারী। তথাপি তাঁর চিন্তার গভীরতা ও মননশীলতার আবরণ ভেদ করে স্ত্রীজাতির সামগ্রিক উন্নতি সাধনে তাঁর ভূমিকা সমাজের সর্বস্তরে তেমনভাবে স্বীকৃতি পায় নি। বুদ্ধিজীবী মননশীল মানুষদের মধ্যেই তার প্রভাব সীমিত ছিল। শরৎচন্দ্রের মতো সাধারণ মানুষদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েনি।

রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের অসাধারণত্ব শুধু, বাইরের জীবনে আবদ্ধ নয়; তাঁর নায়িকারা অসাধারণ দেহে মনে জ্ঞানে প্রেমে সর্বোপরি চারিত্র্যের দৃঢ়তার সতেজ দীপ্তিতে জড়িমাহীন বুদ্ধির আলোয় ভাস্বর। অ্যাভারেজ বাঙালি মেয়েরা এই সব চরিত্রের সঙ্গে সহজে আইডেনটিফাই করতে পারে না, শরৎ চন্দ্রের নারী চরিত্রের সঙ্গে পারে।

রবীন্দ্রনাথ কিছুটা কৌতুক ছলেই শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়েছেন তার সাধারণ মেয়ে মালতীকে দিয়ে একটা অসাধারণ মেয়ের গল্প লিখতে।

কাঁচা বয়সের মায়ায় মালতী ভালোবেসেছিল নরেশকে। উচ্চ শিক্ষার জন্য নরেশ গেল বিলেতে সেখানকার জ্ঞানীগুণী রূপসী অসামান্যাদের দেখে মুগ্ধ হলো নরেশ তাদের তুলনায় বাঙালি কন্যাটি অতি সাধারণ সে কথা বুঝতে রইল না বাকী। এই বাস্তব অবস্থা থেকে কল্পনায় মেয়েটি হয়ে উঠতে চায় অসাধারণ। শরৎবাবুর কলমের আঁচড়ে মালতী নামের মেয়েটা গণিতে এম. এ. পাশ করে আরো বিদ্যার্জনের জন্য চলে যাক য়ুরোপে, সে দেশের জ্ঞাণীগুণী পুরুষেরা দল বেঁধে ভিড় জমাক তার চারপাশে শুধু বিদুষী বলে নয় নারী বলেও আবিষ্কার করুক তাকে। বিদেশি দরদি সমজদার ব্যক্তিরা মালতীকে সম্মান জানানোর জন্য সভা ডাকুক, যে নরেশ সাধারণ বাঙালি মেয়ে জেনে তাকে অবহেলা করেছিল সে এবং তার অসামান্য মেয়ের দল দেখুক মালতীকে, জানুক যে সে মোটেও সাধারণ নয়।

তার নিজের ভেতরের কোনো শক্তি কোনো বোধের জাগরণ নেই, নেই নিজেকে গড়ে তোলবার, যোগ্যতা লাভের দুরূহ পথ অতিক্রমের কোনো প্রয়াস। বাইরে থেকে বানিয়ে তুললেই নারী যেন হয়ে উঠতে পারে বিদুষী মহীয়সী। গল্পের নটে শাকটি মুড়োলে স্বপ্ন শেষ হয় বাকী থাকে কঠিন বাস্তব ঃ

হায়রে সামান্য মেয়ে!
হায়রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়।[২১]

আধুনিক নারীর মেধাবী প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রকে চালিত করে না -- হৃদয় বেগই তাদের কাছে শেষ কথা।

'বীথিকা' (১৯৩৫) কাব্যের অপ্রকাশ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী চেয়েছেন মেয়েরা নিজেরাই বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হবে বহুযুগ ধরে বহন করে চলা সংস্কারের কারাগার

থেকে । মেয়েদের দুঃখ অবমাননায় কবি বেদনা ও লজ্জা বোধ করেছেন, বিশ্বাস করেছেন ''এই দুর্গতির যথার্থ প্রতিকার মেয়েদেরই হাতে। তারা যেদিন নিজের অধিকারের মর্য্যাদা সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করবে সে দিন সে মর্য্যাদা কেউ খর্ব করতে পারবে না।''[২২]

মেয়েদের আত্ম শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি মনে করিয়ে দেন ঃ

বিশ্বেরে দেখ নি ভীরু, কোনোদিন বাধাহীন চোখে
উচ্চশির করি।
স্বরচিত সংকোচে কাটাও দিন
আত্ম - অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন, তাই পুণ্যহীন।[২৩]

কল্যাণী সুন্দরী মাধুর্যময়ী নারী বন্দনায় রত কবি নারীকে দিলেন ভিন্ন মন্ত্রণা ঃ

হে সুন্দরী,
মুক্ত করো অসম্মান, তব অপ্রকাশ-আবরণ।
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে কোরো না কৃত্রিম আভরণ।
সজ্জিত লজ্জার খাঁচা, সেথায় আত্মার অবসাদ --
অর্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ,
ভোগীর বাড়াতে গর্ব খর্ব করিয়ো না আপনারে
খন্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।[২৪]

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে লেখা শ্যামলী (১৯৩৬) কাব্যের 'বাঁশিওয়ালা' কবিতায় বাঁশির অজানা সুরে জেগে উঠল এক বিদ্রোহিনী নারী। অন্য ভাষায় অন্যভাবে সে প্রকাশ করল নিজেকে।

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ করে গড়তে --
রেখেছেন আধাআধি করে।
... ...
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।[২৫]

নিরীহ ঘরোয়া বাঙালি মেয়ে শান্ত হয়ে ঘরের কাজে মগ্ন থাকলে সবাই ভালো বলে। ভীরু আত্ম অবমাননাকর কোমলতা থেকে মুক্তি দেয় অদেখা বাঁশিওয়ালার অজানা সুর 'জেগে ওঠে বিদ্রোহিনী' ঃ

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর,
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক আগুনের ডাক,
... ...
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি;
... ...
ডাক পড়ে অমর্ত্যলোকে;
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে মাথা।

সেখানে কুয়াশার পর্দা - ছেঁড়া
তরুণ-সূর্য আমার জীবন।[২৬]

... ...

অপরিচিত বাঁশিওয়ালা নতুন পথে যাবার ডাক শুনিয়ে গেল ঃ

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘর পোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা - খসা নারী।[২৭]

বাংলা দেশের অখ্যাত মেয়েকে সৃষ্টিকর্তা গড়তে পুরো সময় না দিলেও বাঁশিওয়ালার কাছে পেয়েছে সে 'নূতন নাম' নূতন পরিচয়।

উল্লেখপঞ্জী

১. রবীন্দ্র রচনাবলী /১/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার / পৃষ্ঠা - ৩৩৯
২. রবীন্দ্র রচনাবলী /১/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার / পৃষ্ঠা - ৩৪০
৩. তদেব /পৃষ্ঠা - ৩৪৩
৪. তদেব /পৃষ্ঠা - ৩৪৪
৫. তদেব সোনার তরী/ সোনার বাঁধন/পৃষ্ঠা - ৪৫১
৬. প্রশান্তকুমার পাল/ রবি জীবনী /৪/আনন্দ পাবলিশার্স - ১৩৯৫/পৃষ্ঠা - ৯৩
৭. হুমায়ুন আজাদ/ নারী/ নদী/ ১৯৯২/পৃষ্ঠা - ১১৩
৮. সুতপা ভট্টাচার্য/ সে নহি নহি ঃ রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী মুক্তি ভাবনা/ বিশ্বভারতী/ ১৯৯০/পৃষ্ঠা - ১১
৯. রবীন্দ্র রচনাবলী/১/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/পৃষ্ঠা - ৯৫১
১০. রবীন্দ্র রচনাবলী/৯/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ স্ত্রীর পত্র /পৃষ্ঠা - ৫০৬
১১. হুমায়ুন আজাদ/ নারী/ নদী/ ১৯৯২/পৃষ্ঠা - ১১৩
১২. রবীন্দ্র রচনাবলী/১/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/পৃষ্ঠা -৭৬২
১৩. প্রমথনাথ বিশী / রবীন্দ্র সরণী/ মিত্র ঘোষ ১৩৬৯/পৃষ্ঠা -২২৮-৩০
১৪. রবীন্দ্র রচনাবলী/২/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/পৃষ্ঠা - ৫০০
১৫. নীহাররঞ্জন রায়/ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা/ নিউ এজ পাবলিশার্স-১৩৪৮/পৃষ্ঠা - ১৫৩
১৬. রবীন্দ্র রচনাবলী/২/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/পৃষ্ঠা -৭৯৬
১৭. তদেব
১৮. নীহাররঞ্জন রায়/ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা/ নিউ এজ পাবলিশার্স-১৩৪৮/পৃষ্ঠা - ১৬৯
১৯. রবীন্দ্র রচনাবলী/২/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/পৃষ্ঠা - ৭৯৭
২০. তদেব /২/ /পৃষ্ঠা - ৭৯২
২১. তদেব /৩/ /পৃষ্ঠা - ৫৬
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ চিঠিপত্র/১১/ পত্র সংখ্যা- ২/পৃষ্ঠা - ৪
২৩. রবীন্দ্র রচনাবলী/৩/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ ৩০২
২৪. তদেব / ৩০২
২৫. তদেব / ৪১৪
২৬. তদেব / ৪১৫
২৭. তদেব / ৪১৬

নাটক

রবীন্দ্রনাথের সৃজনাত্মক রচনার মধ্যে নাটকে নারী ভাবনার প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে সে বিষয়ে কয়েকটি নাটক নির্বাচন করে এখানে আলোচনা করা হল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল চিত্রাঙ্গদা(১৮৯২)। কুরূপা পুরুষালী স্বভাবের মনিপুরী রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে স্বামীরূপে কামনা করেছিল। মদন ও বসন্তের সাহায্যে এক বছরের জন্য মোহিনীরূপ লাভ করে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে প্রেমিক ও স্বামী হিসেবে পেয়েছিল। কিন্তু মিথ্যে রূপের মোহ বিস্তার করে পাওয়া এই সম্পর্ক ভালো লাগছিল না তার। কেবলই মনে হচ্ছিল স্বরূপ গোপন করে পাওয়া এই আদর সোহাগ তার প্রাপ্য নয়। সে আত্মপ্রকাশ করে নিজের মর্যাদা ও অধিকার পেতে চাইছিল নারীপুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের প্রকাশ আকাঙক্ষার মধ্যে পুরুষের মনোভাব প্রাধান্য পেত। নারীর দিক থেকে ভালোবাসা জানানোর কাহিনী রামায়ণ মহাভারতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধূসুদন দত্ত তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা দেখিয়েছেন বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা এদের থেকে স্বতন্ত্র, সে শুধু প্রেমিকা হয়ে থাকতে চায়নি, আত্মমর্যাদার সঙ্গে প্রেমিকের কাছে প্রতিষ্ঠা চেয়েছে। নারী মনের এই ভাবনাটিই আধুনিক। চিত্রাঙ্গদার মনে প্রশ্ন জেগেছে ঃ "What is beauty; what is love; what is the true and enduring basis of man-woman relationship?"[১] চিত্রাঙ্গদার চরিত্র মেয়েদের ভাবনা-জগতের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। আত্মপ্রকাশের প্রেরণা থেকে তার সেই বিখ্যাত উক্তি ঃ

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহী, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।'[২]

এই উক্তিকে কারো মনে হয়েছে ঃ This is the quintessence of the new feminist movement which was thus heralded by Tagore. These words inspired the young educated ladies of India in the twentieth century.[৩] আবার এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত হল --- 'ছক ভাঙ্গা নারীকে ছকের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত করার সফল উদাহরণ চিত্রাঙ্গদা(১২৯৯)। একটি বিদ্রোহী স্বাধীন রাজকন্যাকে এতে কামের সহযোগিতায় রূপান্তরিত করা হয় পুরুষের সহচরীতে। . . . সে দেবী নয়, দাসী নয়, তবে স্বাধীন সত্তাও নয়, সে পুরুষের সহচরী বা প্রিয় পরগাছা। সে নিজে যাবে না কোনো সংকটের পথে, নিজে করবে না কোনো দুরূহ চিন্তা, নিজে গ্রহণ করবে না কোনো কঠিন ব্রত, ওই সমস্ত কাজ পুরুষের, সে সব করবে তার স্বামী, সে হয়ে থাকবে স্বামীর সহচরী, বা শিক্ষিত দাসী।'[৪]

আর একভাবে সুতপা ভট্টাচার্য দেখান চিত্রাঙ্গদার সীমাবদ্ধতা। "বিষয়ী হওয়া সত্তেও মেয়েরা কীভাবে পরিণত হয় বিষয়ে --- কোথায় অবরুদ্ধ তার উত্তরণ --- তার উত্তর কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি একইভাবে দিয়েছেন। শকুন্তলার অভিশাপের মতো চিত্রাঙ্গদার বরলাভও রূপক মাত্র ---

কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা ? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান ? হায় আমারে করিল
অতিক্রম আমার এতুচ্ছ দেহখানা, . . .

'দেহ' শব্দে এখানে দ্যোতিত হচ্ছে নিশ্চয় যৌনতা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা প্রাকৃতিকতা। যতক্ষণ নারী এই প্রাকৃতিকতায় নিবদ্ধ ততক্ষণ পুরুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিষয়ীর সম্বন্ধ, 'প্রাকৃতিকতা' থেকে 'মানবতায়' উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই নরনারীর সম্বন্ধ রূপান্তরিত হতে পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে --- যার মধ্যে অসীম মুক্তি।"[৫]

প্রাকৃতিকতার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের লেখায় ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে। মালিনী ভট্টাচার্য প্রাকৃতিকতাকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন। "কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তোলা প্রাকৃতিক প্রভেদের প্রশ্নটির জবাব তাঁর (রমাবাঈ) কাছেও বোধহয় ছিল না। 'নিজের শরীরের ওপর নিজের অধিকারের' প্রশ্নটি নারী মুক্তিবাদীদের কাছে আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর ১২৯৬ বঙ্গাব্দে -- যখন জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা শিশু পালনকে সামাজিকীকরণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ কথিত প্রাকৃতিক প্রভেদকে অস্বীকার করার উপায় ছিল আজকের চেয়ে অনেক কম। স্ত্রী-শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজ সংস্কার তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে এই 'প্রাকৃতিক' পরিস্থিতিকে মেয়েদের কাছে যতটা সম্ভব সহনীয় করার উপায়মাত্র।"[৬] সন্তানধারণ করবার জন্য মেয়েদের ঘরেই থাকতে হবে পুরুষদের ওপর নির্ভর করতে হবে, "এই কার্যকারণ যোগটার ভিত্তিতে অবশ্যই যুক্তি যতটা আছে তার চেয়ে বেশি আছে একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় বিশেষ শ্রেণীগত পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত কিছু সংস্কার। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় এই সংস্কার স্বীকৃত ছিল, এবং এই স্বীকৃতির স্বার্থেই গড়ে উঠেছে নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র স্বভাব সম্পর্কিত তাঁর পরাদর্শন।"[৭]

চিত্রাঙ্গদার রচনাকাল ১২৯৯ থেকে এই ১৪০৬ একশো বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। মানবীচর্চা পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তাই একেবারে আধুনিক নারীমুক্তির দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্গদার নিজের কথা বলে রবীন্দ্রনাথ যা জানিয়েছেন তার মর্ম বোঝা যাবে না।

চিত্রাঙ্গদার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, কেমন মেয়ে সে -- স্বাধীন রাজকন্যা একটা রাজ্য আর তার প্রজাদের সুশাসনে রেখেছিল, অনুরক্ত প্রজাদের কাছে -- 'স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।'[৮] প্রজারক্ষাকারী হিসেবে সে এতই দুরদর্শী ছিল যে অর্জুনের সঙ্গে এক বছরের জন্য যখন প্রেমিকার ভূমিকায় কাটাবে বলে স্থির করেছিল তখনো প্রজা সুরক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছিল --

'কোনো ভয় নাই প্রভু।
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে, বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।'[৯]

রাজারা যা যা করে সবই করতো সে এমন কি গভীর জঙ্গলে গিয়ে শিকারও। নারী পুরুষ উভয়েরই যৌনতা হল স্বভাবিক প্রবৃত্তি। তাকেও স্বীকৃতি দিতে চিত্রাঙ্গদার সাহসের অভাব হয় নি। সে নিজের স্বভাব ও প্রবণতা অনুযায়ী নির্বাচন করেছিল বীর শ্রেষ্ঠ মহাভারতের নায়ক অর্জুনকে। একজন আধুনিক নারীও তার সঙ্গী নির্বাচনে এর চেয়ে আর কি বেশি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারত? তার যদি ওরকম উজ্জ্বল বীর্যপূর্ণ অতীত জীবন না থাকত তাহলে সে পুরুষ শ্রেষ্ঠ বীর রূপবান অর্জুনকে লাভ করেই নিজেকে চরিতার্থ মনে করতো। এবং রূপ হারানোর বেদনায় গোপনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে বাকী জীবন নীরবে চোখের জল ফেলে পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান মানুষ করতো বা তাকে অস্বীকার করতো কুন্তীর মতো। কিন্তু সে পেতে চেয়েছে আপনার মূল্য।

তাই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে উচ্চারণ করে 'আমি চিত্রাঙ্গদা'। কোনো রাজার মেয়ে, কোনো বীরপুরুষের স্ত্রী -- এসব তার পরিচয় নয়। সে চিত্রঙ্গদা। এই নিজের নামে নিজের পরিচয় এরমধ্যে রয়েছে নারীর স্বাধীন অস্তিত্বের স্বীকৃতি। সে সামান্যা হবে না, হবে না উপেক্ষা অনাদরের বস্তু। চিত্রাঙ্গদা চেয়েছে সেই অধিকার যা পুরুষের সমতুল্য। চিত্রাঙ্গদা নিজে সামান্য ঘরের সামান্যা নারী নয়, যার কাজের ভাগ নিতে চেয়েছে সেও সাধারণ পুরুষ নয়। তাদের দায় দায়িত্ব তুচ্ছ গেরস্ত রকমের ঘরকন্নার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে তাও না। অর্জুনের জটিল রাজনৈতিক জীবন ভারত ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, সেই জীবনের সহায় এবং সহচরী হতে চায় যে সে কি ছকে বদ্ধ সামান্যা নারী মাত্র। নিজের গুণকে পরখ করে নিতে চেয়েছে উপযুক্ত পটভূমিকায়। নিজস্ব সত্তা না থাকলে সে তো কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারত না, জানাতে পারত না আপনার আকাঙক্ষার কথা। মহাভারতের সাধারণ কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের সাহসী বক্তব্য উপস্থাপনের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। দুরূহ চিন্তা, কঠিন ব্রত এসবের ভাগ চাইতে শিখল বাঙালি মেয়েরা সেটাই বা কম কিসে।

চিত্রাঙ্গদা বিশেষ এক শ্রেণীর নারীর জন্ম দিয়েছে, যে সামান্যা নয়, আবার দেবীও নয়। উনিশ শতকের সংস্কার এই দুই খোপে নারীকে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। ক্ষিতি সমালোচনা করেছিল এই সামান্যাদের আর সুরদাস দেবী বানিয়েছিলেন অসামান্যাদের। এই আরোপিত দ্বিবিধ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তৃতীয় সত্তার সন্ধান করেছে চিত্রাঙ্গদা। সেই প্রথম ভেবেছে সামান্যা আর দেবীর বাইরে আছে আপন আশা আকাঙক্ষা আর স্বপ্ন দিয়ে তৈরি মানবীর নিজস্ব ভূবন। সেই ভুবনের আকৃতি প্রকৃতি সীমারেখা তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। হয়তো পুরুষের তৈরি সংস্কারের অনুভূতি জড়িয়ে রেখেছে তবু তার মধ্যে সে অনুভব করেছে নারী অস্তিস্তের স্বতন্ত্র উপস্থিতিকে -- 'স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ'।[১০] চিত্রাঙ্গদা তার স্বতন্ত্র চরিত্রের স্বীকৃতি পেয়েছিল তার নির্বাচিত প্রেমিক অর্জুনের কাছেও। অর্জুন রূপসী মদালসা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল শুধু তাই নয়, বীর শ্রেষ্ঠ অর্জুন আরো এক বীর নারীর আত্মপরিচয় জানতে জানতে বলেছিল, 'বলো বলো। শ্রবণ লালসা ক্রমশ বাড়িছে মোর।'[১১] চিত্রাঙ্গদার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানবার পর বলেছিল 'প্রিয়ে আজ ধন্য আমি'।[১২]

চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে হয়তো ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকের উপযুক্ত স্ত্রীর আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু এভাবেই বদ্ধ সমাজের নিজস্ব প্রয়োজনের টানেই মেয়েদের কাছে খুলেছে একটা একটা দরজা। বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিপন্থী মধ্যপন্থী সব শ্রেণীর পুরুষরাই নারীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সংশয়ে ভুগতো। রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা সেই পরিবেশে মাঝে মাঝে খোলা হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল চিত্রাঙ্গদা সেই খোলা হাওয়ায় ফোটা ফুল।

১৮৯৬ সালে লেখা হয় মালিনী। ধর্মের বিভিন্ন রূপ ও আদর্শ বিভিন্ন পাত্রপাত্রীকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে, প্রত্যেকে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা, পারিপার্শ্বিক, মানসিক প্রবণতা অনুসারে ধর্মকে গ্রহণ করেছে। এই ধর্মের আদর্শ তাদের জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে কি বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করেছে এবং তারা কিভাবে তার সামঞ্জস্য বিধান করতে চেষ্টা করেছে, তারই অন্তদ্বন্দ্ব এই নাটকের বিষয়বস্তু।[১৩] ঔপনিষদিক পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। ধর্মবিশ্বাসের প্রচলিত আদর্শকে দ্বন্দ্বহীন চিত্তে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর কবি সত্তা স্বীকার করে নিয়েছিল মানবধর্মকে। মালিনীর মধ্যে দিয়ে সেই মানবধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। মালিনী নামের মেয়েটি নতুন সত্য ধর্মের প্রেরণায় কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, জীবনে তাকে কতখানি সার্থক করে তুলতে পেরেছে এখানে তা দেখা হবে। মালিনী স্ত্রীলোক হয়েও এমন বিষয়ে মনোনিবেশ করেছে যা একান্তভাবে পুরুষের এলাকাভুক্ত। সমাজে ধর্মের অনুশাসন চিরকাল প্রচার করেছে পুরুষেরা, মালিনী তার নিজের অনুভব নিয়ে প্রবেশ করেছে সেই এলাকায়। ফলে সমাজে দারুণ আলোড়ন উঠেছে। বয়সে নবীন মালিনী মানুষের মঙ্গলকর্মে আপনাকে উৎসর্গ করতে চায়। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্ম জটিলতা ভেদ করে মানুষের যে সত্য প্রতিষ্ঠিত মালিনী তার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু মেয়েদের ধর্ম তো আলাদা সে কথাই বলেছেন মালিনীর মা মহিষী ঃ

ধর্ম কি খুঁজিতে হয়?
সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতিময়
চিরকাল আছে। ধরো তুমি সেই ধর্ম,
সরল সে পথ। লহো ব্রতক্রিয়া কর্ম
ভক্তিভরে। শিবপূজা করো দিনযামী,
বর মাগি লহো, বাছা, তাঁরি মতো স্বামী।
সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা,
শাস্ত্র হবে তাঁরি বাক্য, সরল এ কথা।
....
রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।[১৪]

এর বাইরে যেন মেয়েদের আর কোনো ধর্মবোধ থাকতে নেই। মালিনীর অনুপ্রাণিত মূর্তি শেষ অবধি রাজমহিষীকেও আজীবনের সংস্কার ত্যাগ করতে বাধ্য করে, তিনি মেয়ের ধর্মকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। নবধর্মের প্রভাব রুখতে নির্বাসন চায় প্রজারা রাজকন্যা মালিনীর। কিন্তু সে পথে প্রজাদের মধ্যে নেমে এলে এই বালিকার করুণামাখা মূর্তি প্রজাদের মন হরণ করে। তারা নির্বাসনের পরিবর্তে তাকে নিজেদের হৃদয়ে স্থান করে দেয়।

প্রাচীন আর্যধর্মকে রক্ষা করবার জন্য দুজন পুরুষ এগিয়ে আসে নেতৃত্ব দিতে — ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়। ক্ষেমংকরই প্রধান তার বন্ধু সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের অনুগামী মাত্র। ক্ষেমংকরের ভয় শধু নবধর্মকে নয়, তার ভয় নারীকেও ঃ

জেনো ভাই
অন্য অরি নাহি ডরি, নারীরে ডরাই ।

তার কাছে অস্ত্র যায় টুটে; পরাহত
তর্কযুক্তি, বাহুবল করে শির নত --
নিরাপদে হৃদয়ের মাঝে করে বাস
রাজ্ঞীসম মনোহর মহাসর্বনাস।[১৫]

পুরুষ যদি নিজের প্রয়োজনে নারীকে না লাগাতে পারে, নারী যদি তার গুণ মাধুর্য কোমলতা করুণা এই সব মানবিক গুণকে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে চায় তাহলেও পুরুষ তাকে ভয় পায় । নারী থাকবে সম্পূর্ণই পুরুষের আয়ত্তে। বন্ধু সুপ্রিয়কে রেখে সৈন্য সংগ্রহ করতে বের হয় ক্ষেমংকর এবং বন্ধুকে সাবধান করে যায় কোনো কুহকে না ভুলতে । কিন্তু সনাতন ধর্মে ক্ষেমংকরের মত সুপ্রিয়র আস্থা ছিল না । তার নবধর্মের প্রতি অনুরাগ মলিনীর প্রতি অনুরাগে রূপান্তরিত হয় । নবধর্মকে রক্ষা করা এখন তারও কর্তব্য।

ক্ষেমংকর বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে বিদ্রোহ করে নবধর্মের মূলোৎপাটন করতে চায়, তার সংকল্প মালিনীর প্রাণদন্ড। সুপ্রিয় এসব মেনে নিতে পারে না । বন্ধুকে এত বড় অপকর্ম থেকে বিরত করার জন্য রাজাকে সব জানিয়ে দেয়। মালিনী সব কিছু জানবার পরও ক্ষেমংকরকে পুজ্য অতিথির মতো সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নিতে চায় । রাজা ক্ষেমংকরকে বন্দী করে এনে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন । মৃত্যুর আগে ক্ষেমংকরবন্ধুকে দেখার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে । আলিঙ্গনের জন্য বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধু সুপ্রিয় কাছে এলে তার মাথায় নিজের হাতের বাঁধা শিকল দিয়ে সজোরে আঘাত করে। সুপ্রিয়র তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, ক্ষেমংকর তার মৃতদেহের ওপর পড়ে ঘাতককে ডাকে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মালিনী হতচকিত হয়ে পড়লেও প্রেম ধর্মে বিশ্বাসী সে রাজার কাছে প্রার্থনা জানায় ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করবার জন্য।

মালিনী রাজকুমারী হয়েও বিশ্বসংসারের পথে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল। প্রথাবদ্ধ ধর্মের মধ্যে বেড়ে উঠলেও সে আচার সর্বস্বতার বাইরে সত্য ধর্মকে গ্রহণ করার মতো উদার মানসিকতার অধিকারী ছিল। অনেকে তার চরিত্রে সত্যধর্মের অনুভবকে তাৎক্ষণিক এক উপলব্ধি বলে মনে করেছেন। কারণ প্রজাদের মাঝে গিয়ে তাদের হৃদয় জয় করবার পর ঘরে ফিরে তার মধ্যে আর সে উন্মাদনা দেখা যায় নি । সে সাধারণ মানব কন্যার মত মার কোলে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ঘুমোতে চায়। বিপক্ষ দলের সুপ্রিয় তার কাছে এলে সে সুপ্রিয়র জিজ্ঞাসার সামনে নিজেকে দরিদ্র মনে করে ।[১৬] এসব সত্ত্বেও মালিনীর চরিত্রের অনন্যতা অন্যত্র। মানবধর্মের সুউচ্চ মহান আদর্শকে সে কম বয়সেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল, রাজগৃহের ভোগ ঐশ্বর্যকে অবহেলা করে জনগণের মঙ্গল কামনার প্রেরণা অনুভব করেছিল নিজের মধ্যে। সে কোনো দেবী নয় বলেই সুপ্রিয় চরিত্রের নমনীয়তা নবধর্মকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা স্বভাবতই সুপ্রিয়র প্রতি তার মনোভাবকে প্রেমে পরিণত করেছে। সুপ্রিয়কে সে ধর্মপথের সহায় হিসেবে সঙ্গী মনে করেছে । শুধু তাই নয় সত্য ধর্মে তার বিশ্বাস যদি দৃঢ় না হত তাহলে সুপ্রিয়র হত্যাকারী ক্ষেমংকরকে সে ক্ষমা করার কথা বলতে পারত না। বিমানবিহারী মজুমদার এই নাটকের বিশিষ্টতা বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন, 'Looked at from the standpoint of the history of the reawakening of women in modern India the drama may be called the herald of the new age . The new women refuses to abide by the standard of traditional religion .[১৭]

রক্তকরবী (১৯২৬) নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবী সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি । চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ । ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি। . . . মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, — মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"[১৮] পুরুষের নির্মিত যান্ত্রিক - সভ্যতায় মানুষের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে । সামঞ্জস্যহীন সভ্যতার ইমারত এক দিকে ঝুঁকে পড়েছে মানুষের সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য, সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজন মানবীর । ". . . সমাজ বীরত্বের একনিষ্ঠ পূজারী, . . . এ ক্ষেত্রে সে আজও শিকারজীবী আদিম মানুষের ধ্যানধারনার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে, তার কাছে পৌরুষ একটি গুণের নাম, মেয়েলিপনা একটি দোষ।"[১৯] সমাজ মানসের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ সমাজে নারীর অংশগ্রহণকে দেখাতে চাইলেন অন্যভাবে । 'মেয়েলিপনা' নয় মানবীর গুণে সমৃদ্ধ হোক সমাজ "একদল লোক, তাহারা সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ-মানসের বিভিন্ন স্তরের প্রতীক; তাহারা সকলেই লোভের, প্রথা ও সংস্কারের শৃঙ্খলে নিজেদের কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ। সেই কারাগারের জানালার লোহার জালের বাহির হইতে প্রেম ও প্রাণশক্তির প্রতীক, মুক্ত জীবনানন্দের প্রতীক নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিতেছে 'চলে এস । তোমাদের শিকল ছিঁড়ে মুক্ত জীবন প্রাচুর্যের প্রেম ও আনন্দের জগতে চলে এস'।"[২০]

নন্দিনী প্রেম মাধুর্য আর সৌন্দর্যের প্রতীক মাত্র হয়ে নেই এই নাটকে; সে এখানে চালিকা শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করেছে । জালের আড়ালে নিষ্ঠুর ক্ষমতাবান রাজাকে সবাই ভয় পায়, যক্ষপুরীর নিষ্ঠুরতা দেখতে দেখতে নন্দিনী সেই রাজাকে কখনো করুণা করেছে কখনো তাকে ঘৃণা করার স্পর্ধা দেখাতে পেরেছে। প্রবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি সে পেয়েছে নিজের ভিতর থেকে ।

নন্দিনী 'আনন্দ ও প্রেমের প্রতীক'।[২১] রঞ্জন যৌবন ও 'আনন্দের প্রতীক — আনন্দে সে সকলের মন রাঙাইয়াছে।'[২২] যৌবন শক্তি প্রেম সৌন্দর্য মাধুর্য সব মিশিয়ে দুটো চরিত্র কল্পনা করলেন ---- নন্দিনী আর রঞ্জন। পুরুষের (রাজার) ঔদ্ধত্য ক্ষমতার অহংকার লোভ তার নিজের শুভ অংশ (রঞ্জন) কে হত্যা করেছে । বাকি আছে নারীশক্তি নন্দিনী সে শক্তির দম্ভকে সমতলে নামিয়ে রাজা প্রজা সকলকে মিলিয়ে দেবে এই তার কাজ । সে ভালোবাসে সকলকে রাজা, বিশু পাগলা, প্যালোয়ান, ফাগুলাল, কিশোর রঞ্জন সবাই । ভালেবাসাই মানুষকে বাঁচাতে পারে ধ্বংসের হাত থেকে । নন্দিনীর ভূমিকা ট্রাডিশনাল নারীর নয়; সে অ্যাক্টিভ; সে শুধুই বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষের মনে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে গেছে তাই নয়; সে নিজেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে । রাজা নিজের শক্তির বিরুদ্ধে অভিযানে যার হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছে সে নন্দিনী।— বিশু ফাগুলালরা নন্দিনীকে খুঁজতে বেরিয়ে জানতে পারে — 'সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।'[২৩] মানবীসত্তার সক্রিয় শক্তিকে এই নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে। বিমানবিহারী মজুমদারের ভাষায় ঃ Nandini in the Red Orleanders is the symbol of the hopes and aspirations of the new age. She moves freely in different sections of society carring the massage of joy and libaration to laboures, scholers, petty bureaucrats and above all to the King, imprisoned in the cell of his own desires and ambitions.[২৪]

অনুষ্টুপ পত্রিকায় রক্তকরবী বিষয়ে লেখা একটি প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ উৎপল দত্তের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন ''রক্তকরবী তে বায়বীয় সব তাৎপর্য খুঁজে মরুক ভববাদী পন্ডিতের দল,, কিন্তু এ নাটক তুলে ধরেছে 'এ যুগের শ্রেণী-সংগ্রামের সারবস্তুটিকে যা শুধু মগজে আঘাত করে না, হৃদয়ে আলোড়িত করে',''[২৫] শ্রেণীসংগ্রামের নীরস তথ্যকে হৃদয়ে পৌঁছে দেবার সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে এক মানবী -- নন্দিনী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর তাত্ত্বিক ধারণাকে রূপ দিয়েছেন বেশ কিছু চরিত্রে সে দিক থেকে দেখলেও নন্দিনী নতুন যুগের পক্ষে কার্যকারী নতুন তত্ত্বের প্রবক্তা কিন্তু সেখানেই সে ফুরিয়ে যায় নি, তার প্রাণ চঞ্চল আনন্দময় প্রকৃতি আপন খুশিতে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র পাতাল পুরীর বদ্ধ সমাজে প্রয়োজন উপলব্ধ হয়েছে নন্দিনী মতো এক মানবীর।

বাঁশরি (১৯৩৩) নাটক বিলিতি য়ুনিভার্সিটি থেকে পাশ করা এক অতি আধুনিক মেয়ের কাহিনী । রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর নায়িকারা ছিল হয় অশিক্ষিত নয়তো সামান্য শিক্ষিত তারপর পঞ্চাশ ষাট বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে মেয়েদের জীবন । দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য এবং সফলতাও পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের লেখায় এই উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের দেখতে পাওয়া যায় । শিক্ষার সুযোগ বাইরের জগতে পুরুষদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সহজে মেলামেশার অনুকূল পরিবেশ মেয়েদের অনেকাংশে আত্ম-প্রত্যয়ী জড়তা শূন্য ও সাবলীল করে তুলেছে । তার ফলে নিজেদের জীবন বিষয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী হয়েছে। জীবনের বৃহৎ পরিধি বিষয়ে সচেতন হয়েছে ।

বাঁশরি সরকার কলেজে পড়বার সময় ভালোবাসতো বাংলার বাইরে থেকে পড়তে আসা শম্ভুগড় রাজ পরিবারের ছেলে সোমশংকরকে । এই যুবাকে আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল বাঁশরি । দুজনের প্রেম পরিণয়ের অপেক্ষায় ছিল। মাঝখানে এল এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী পুরন্দর । সে প্রচলিত গুরুদের মত নয়। তার অনেক কিছু আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতো --- পার্থক্য হল জীবনের বহু শাস্ত্রে সে সুপন্ডিত এবং তার মিশন হচ্ছে তরুণদের ব্রতে দীক্ষিত করা । যদিও তার ব্রত কি সে বিষয়ে নাটকে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি তবে মনে হয় কোনো মঙ্গলজনক কাজ কিছু। সে তার এক মাত্র ছাত্রী অসামান্য সুন্দরী সুষমার সঙ্গে সোমশংকরের বিয়ের আয়োজন করেছে। সুষমা ভালোবাসে সন্ন্যাসী পুরন্দর কে । এই প্রেমহীন বিয়ের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে বিবাহে পরস্পরের প্রতি মোহ না থাকলে ব্রতের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে।

বাঁশরি খ্যাতিমান সাহিত্যিক ক্ষিতীশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে । সাহিত্যিককে রিয়ালিজিমের শিক্ষা দিতে চায় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় করিয়ে দিয়ে, তার কলমে আনতে চায় যথার্থ বাস্তবের ছবি। সোমশংকরের সঙ্গে সুষমার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় বাঁশরি যে হারেনি তা বোঝাবার জন্য হঠাৎ ক্ষিতীশকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও ক্ষিতীশকে বিয়ে করাকে তার মনে হয়েছে আত্মহত্যার তুল্য তবুও। এরপরই সোমশংকরের কাছে সে জানতে পারে যে সোমশংকর আগের মতই ভালবাসে বাঁশরিকে শুধু বৃহৎ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করার জন্য গুরু পুরন্দরের আদেশে সুষমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। একথা জানবার পরেই বাঁশরি শান্ত হয়ে গেছে তার তীব্র তেজ প্রশমিত হয়েছে চোখের জলে।

ক্ষিতীশকে বিবাহ করা অর্থাৎ আত্মহত্যা করা থেকে বিরত হয়েছে । বাঁশরি নাটকের কাহিনী অংশ হল এই ।

বাঁশরি নাটকে সুষমা, সোমশংকর ও সন্ন্যাসী পুরন্দর তিন চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বাঁশরি। অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়া সুষমার অসাধারণত্বের আর কোনো প্রমাণ নাটকে নেই । সোমশংকর এবং পুরন্দর দুজনের কথায় নির্ভর করে তাকে অসাধারণ বলে ধরে নিতে হয় । পুরন্দরকে সাধারণ মানুষের উর্ধে অসামান্য করে দেখানোর চেষ্টা আছে- ''নানা বিরুদ্ধ কিংবদন্তী তাহার চারিদিকে ঘনীভুত হইয়া একটা রহস্যের কুয়াশার সৃষ্টি করিয়াছে;''[২৬] মনকে স্পর্শ করতে পারে এমন কিছু কথাও তার মুখে বসানো হয়েছে । কী তার ব্রত কীভাবে সে ব্রত পালন করা হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। সংসার বিযুক্ত সন্ন্যাসী রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারে বারে আসে সংসারী মানুষকে ডাক দেয় নিজেদের স্বার্থের কেন্দ্র ছেড়ে বৃহতের কল্যাণে নিয়োজিত হবার জন্যে । কবি এই নাটকেও পুরন্দরকে এনেছেন মহৎ উদ্দেশ্যে; কিন্তু বড্ড বেশি নীরক্ত তার উপস্থিতি ।

সোমশংকর পোশাকে চেহারায় মধ্যযুগ থেকে উঠে আসা এক চরিত্র। বাংলার বাইরের এই যুবকটির কলকাতায় পড়তে এসে আধুনিকতায় হাতে খড়ি হয়েছে বাশাঁরির কাছে । পরে আকৃষ্ট হয়েছে সন্ন্যাসী পুরন্দরের প্রতি এবং সন্ন্যাসী কথিত ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণ চঞ্চল প্রেমিকা বাঁশরিকে ছেড়ে শান্ত শিষ্ট রূপবতী পুরন্দরের ছাত্রী সুষমাকে বিয়ে করতে চলেছে । যদিও অন্তরে জাগ্রত রয়েছে বাঁশরির প্রতি তার প্রেমের অনির্বাণ আলো।

এই পটভূমিকায় বাঁশরি সরকারকে দেখতে হবে। প্রথমনাথ বিশী বলেছেন ঃ ''এই শাড়ি-পরা ঘূর্ণি হাওয়াটি নাটকের হাসির দিগন্ত হইতে অশ্রুর দিগ্‌বলয় পযন্ত হু হু শব্দে ছুটিয়া গিয়াছে; তাহার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে চিরদিনের চেনা আকাশ খানার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া অভিনবত্ব প্রকাশ করিয়াছে; তাহার মর্মান্তিক দীর্ঘ-- নিঃশ্বাস সোমশংকর- পুরন্দর-সুষমার ব্রতনিষ্ঠ আদর্শের শুষ্ক পাতা উড়াইয়া একেবারে ভাবী বঙ্গ সাহিত্যের বক্ষ- পঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,''[২৭]

বাঁশরি উচ্চশিক্ষিত সমাজের উঁচুতলার মেয়ে । তার কথায় আচরণে, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার, পরিচয় পাওয়া গেছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিশ্লেষণ করার দক্ষতা -- জড়তাহীন বুদ্ধির আলোয় তার ব্যক্তিত্ব মোহনীয় হয়ে উঠেছে। তার ব্যক্তিত্বের সবটাই ব্যয় হয়েছে সোমশংকরের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জটিলতার সমাধানে। স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে সাহিত্য রচনার প্রকৃত লক্ষ্য ঠিক করে নিতে নানা উপদেশ দেয়, শিক্ষা দেয় ভাব প্রকাশের পদ্ধতি বিষয়ে । তার কথায় হীরে মুক্তোর দ্যুতি থাকলেও সে লিখতে পারে না কেননা ''আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা --- সেই বলা তো চিরকালের । আমাদের বলা নগদ বিদায়, হাতে হাতে, দিনে দিনে । ঘরে ঘরে মুহূর্তে মুহূর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায় ।''[২৮] চরিত্রে দুর্বল ক্ষিতীশ আর্টিষ্টের মর্যাদা পায় কিন্তু বাঁশরি অনেক বেশি উন্নত বুদ্ধির অধিকারী লোকের মনের গতি প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না লেখায় । অর্থাৎ শিল্পী বা আর্টিষ্ট হবার ক্ষমতা আছে পুরুষদের, মেয়েদের ক্ষমতা এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। প্রেমকে জীবনের মূলে ধরে নিয়ে বাঁশরির জীবন আর্বতির্ত হয়েছে । বাঁশরি যখন জানতে পারল সোমশংকর বাঁশরিকে ভালোবাসে আগের মতোই, শুধু 'যে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো।

তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও'[২৯] সে জন্যই সুষমা সেন কে বিয়ে করতে রাজী । সে বাঁশরিকে ভালোবাসে, সুষমারও মন বাঁধা পড়ে আছে সন্ন্যাসী পুরন্দরের কাছে -- দুজনেই আত্মোৎসর্গ করেছে ব্রতের কাছে । সোমশংকরের কাছে ভালোবাসার স্বীকৃতি পাবার পর বাঁশরিও আর একভাবে ত্যাগের দুঃখকে বরণ করে নিল জীবন । ক্ষিতীশ কে বিয়ে করার দুর্ভোগ থেকে মুক্ত হয়ে চির কুমারীই থেকে গেল সে । শেষ অবধি সন্ন্যাসী পুরুন্দরকে প্রণাম জানাল, 'জয় হোক সন্ন্যাসীর' বলে । কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পুরন্দরের ব্রত ঠিক কি ধরনের নাটকে কোথাও তা স্পষ্ট ভাবে বলা হয় নি ; তার ফলে বাঁশরির মতো মেয়ে কোন ব্রতের কাছে সব জলাঞ্জলি দিল তা বোঝা গেল না । এর ফলে বাঁশরি চরিত্রের উজ্জ্বলতা অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে । রবীন্দ্রনাথ নিজে পুরুষ বলেই হয়তো পুরুষ চরিত্রের কোনো বিশেষ দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন । শক্তিমতি নারী পুরুষকে বশীভূত মোহাচ্ছন্ন করে বৃহৎ কর্মের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই তিনি বৃহৎ কর্মে অংশগ্রহণকারী পুরুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন এইসব প্রভাবময়ী নারীদের থেকে ।

প্রমথনাথ বিশী বাঁশরি চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন। "কিন্তু এই ব্রতের সত্যই প্রতিকুল যদি এই বিবাহে কিছু থাকে, তবে তাহা বাঁশরীর চরিত্র। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সর্বদা জীবন গ্রন্থিকে অলগ্ন করিয়া দেখিতে উদ্যত; সে বুদ্ধিবাদিনী, সন্দিগ্ধা, এক রকমের নাস্তিক। এই ধরনের মানুষ পরের কথায়, -- সে কথা হোক না ভালো, -- চলিতে পারে না। বিশেষত বাঁশরী অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, পরের চাপানো ব্রতকে অনায়াসে ঘাড়ে বহন করা তাহার অসাধ্য। দুঃখ সহ্য করিতে সে পরাঙ্মুখ নয়, নিজের ব্যক্তিত্ব সাধনার জন্য সে যৎপরোনাস্তি দুঃখ বহন করিতে প্রস্তুত। তাহার এই cynical ব্যক্তিত্বই ব্রত পালনের পক্ষে যথার্থ প্রতিকূলতা।"[৩১]

বাঁশরি কতটা আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিতে পারল সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে সব মেনে নেওয়ার জায়গা থেকে সরে এসে বাঁশরি সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পেরেছে, প্রেমিকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভেঙে পড়ে নি, প্রত্যাখানের কারণ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে নয় একথা জেনে নিজের উদ্দাম প্রেমকে সংযমের কঠিন শাসনে বাঁধতে পেরেছে। এমন কি মহান জীবন ব্রতের প্রচারক সন্ন্যাসী পুরন্দরও স্বীকার করেছে বাঁশরীর ব্যক্তিত্বকে --- "তোমার কথা কখনোই ভুলি নি। ভোলবার মতো মেয়ে নও তুমি। নিত্যই একথা মনে রেখেছি, তোমাকে চাই আমাদের কাজে --- দু র্লভ দুঃসাধ্য তুমি, তাই দুঃখ দিয়েছি।"[৩২] এই সব অসামান্য নারীরা হয়তো মূল্য পাবে অসামান্য পুরুষদের কাছেই।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণী' লিখেছিলেন অল্প বয়সে। অনেক দিন পর্যন্ত নাটকটির ত্রুটি তাঁকে পীড়া দিয়েছে পরিণত বয়সে পুরনো নাটককে নতুন করে লিখলেন নাম দিলেন 'তপতী' (১৯২৯)। রাজা বিক্রম কাশ্মীর জয় করতে গিয়েছিলেন সেখানকার রাজ বংশের বিশ্বাসঘাতক খুড়ো এবং কিছু কাশ্মীরি সৈন্য আমত্যের সহযোগিতায় কাশ্মীর জয় করেন। কাশ্মীর রাজকন্যা সুমিত্রা আগুনে আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু জলন্ধরের রাজা বিক্রম সুমিত্রাকে রাণী রূপে লাভ করলে হত্যা লীলা বন্ধ করে ফিরে যাবে এবং কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এই শর্ত মেনে সুমিত্রা বিক্রমকে বিয়ে করতে রাজী হয়। বিক্রম সুমিত্রাকে তীব্রভাবে ভালোবাসতেন, সেই ভালোবাসার নির্দশন স্বরূপ যুদ্ধে সে সব সৈন্য সামন্ত সুমিত্রার আত্মীয় পরিজন রাজাকে সাহায্য করেছিল তাদের সকলকে জলন্ধরে আমন্ত্রণ করে এনে বসান ও যথেচ্ছ রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে দেন। তারা ক্রমশ অত্যাচারী হয়ে প্রজাদের দুরবস্থার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাণীর প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যে রাজা রাজকার্য ভুলে রাণীকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

রাজার এই আচরণ রাণীকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। কাশ্মীরি অমত্যদের হাতে জলন্ধরের প্রজারা অত্যাচারিত হতে থাকলে রাণী তার প্রতিবাদ জানাল। বিক্রম রাণীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয় এই কথা মনে রেখো।'[৩৩] মেয়েরা যখনই তার অধিকার বুঝে নিতে চেয়েছে অথবা পুরুষ তাকে যে অধিকার দিয়েছে তার বাইরে কিছু অর্জন করতে চেয়েছে তখনই বাধা এসেছে। পুরুষ সমাজের বৃহদংশ অধিকার সাম্যে বিশ্বাসী নয়। এমন কি সাম্য না হোক ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ও তারা নারাজ। তাই রাণীর এই নাটকে ভূমিকা হল রাজার ভালোবাসার কামনার সম্পদ ও রাজকূলের অলংকার মাত্র হয়ে থাকা। সুমিত্রা চায় অন্য অধিকার রাজার সম্পত্তি নিয়ে প্রজাদের দান করতে চায় না সে; সে চায় ''অন্যায়ের হাত থেকে প্রজা রক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ-সব তো বন্দিনীর বেশভূষা -- এ বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ কর সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী! সে আমি নই।''[৩৪]

বিক্রম সুমিত্রার মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে প্রজাদের ওপর অত্যাচারকে কেন্দ্র করে -- বিশেষ করে মেয়েদের বিরুদ্ধে অত্যাচার। লক্ষ করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের একেবারে প্রাচীনতম অবস্থান থেকে দেখেছেন। যে সময় মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত পুড়ে মরাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান মনে করত। নারী জীবনের সর্বোত্তম পরিচয় সতীত্বে সেই ঐতিহ্যে মেয়েরা বিশ্বাস করত। তাই ভৃগুকুট পাহাড়ের সতী তীর্থে মেয়েরা যায় পূজো দিতে সতীর সিঁদুর পরতে স্বামীর কল্যাণ কামনায়। প্রায় পাঁচশ বছর আগে মহিষী মহেশ্বরী স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হয়েছিলেন এখানে। রানী সুমিত্রাও এখানকার সিঁদুর পরেছিলেন বিয়ের সময়ে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মেয়েরা সমাজের দুর্বলতম অংশ বলে রাজার আশ্রিত লোকেরাও তাদের উপর অত্যাচার করার সাহস পায়। কাশ্মীরি আমত্য ক্ষমতালোভী শিলাদিত্য অর্থোপার্জনের সহজ উপায় খুঁজে বার করতে সতী তীর্থে মেয়েদের ওপর কর বসিয়েছে। শুধু তাই নয় এই তীর্থে মেয়েদেরই প্রাধান্য তাই রাজার অনুচরেরা সুন্দরী মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতেও শুরু করেছে। রানী সুমিত্রা যদিও জলন্ধরের সব প্রজাদের দুঃখ কষ্টে বিচলিত তবু নিজে মেয়ে বলে মেয়েদের লাঞ্ছনায় বিশেষ করে উদ্বিগ্ন। প্রজাদের দুঃখ কষ্টকে অবহেলা করে রাজ কর্তব্যে উদাসীন বিক্রম প্রেমের দেবতা অনঙ্গ দেবের পূজার আয়োজন করলে সুমিত্রা সরাসরি রাজ বিরোধিতায় নামে, শক্তির দেবতা ভৈরবের মন্দিরে পূজো করতে প্রস্তুত হয়। রানীর আত্মীয় পরিজন সুমিত্রার প্রতি বিক্রমের দুর্বলতার সুযোগে অত্যাচারী হয়ে উঠছে দেখেও রাজা ক্লীবের মত আচরণ করেছে। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাজাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে সুমিত্রা এমন কি 'নারীর বাহুর সাহায্য যদি চাও তো প্রস্তুত আছি'[৩৫] বলে জানিয়েছে। রাজার মনে হয়েছে এ 'নারীর মুখের কথা নয়।' প্রেমের মধুর বাক্য ছাড়া রাণীর মুখে আর কিছু আশা করে নি রাজা। রাজা বিশ্বাস করতে চায় না তার আশ্রয়ে যে সব বিদেশী আমত্য সৈন্য আছে তারা প্রজাদের ওপর কোনো অন্যায় অত্যাচার করতে পারে। অত্যাচার যে হচ্ছে এটা অত্যুক্তি। প্রজাদের পক্ষ নিয়ে সুমিত্রার দৃঢ়তা দেখার পর রাজার প্রেমের মুখোশ খুলে গেছে বেরিয়ে পড়েছে অহংকার সর্বস্ব পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ। রাণী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে শুনে উত্তেজিত রাজা বিক্রম বলেছেন 'ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো, বেঁধে নিয়ে এসো শৃঙ্খল দিয়ে -- স্বৈরিনী! . . . মুগ্ধ আমি! ধিক আমাকে! অন্ধ, দেখতেই পাই নি, সিংহাসনের আড়ালে বসে কাশ্মীরের কন্যা চক্রান্ত করছিলেন। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই। অন্তঃপুরে ওকে কে রাখবে! কারাগার চাই।'[৩৬] সুমিত্রা চেয়েছিল রাজার যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে প্রজাদের কল্যাণ সাধনের ব্রত গ্রহণ করবে দুজনে। রাজা মহিষী চান নি চেয়েছিলেন আজ্ঞাবহ দাসী। তাই রাজার মদন উৎসবের আয়োজনে জোর করে সুমিত্রাকে অংশ গ্রহণ করাতে চাইলে সুমিত্রা কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একবার শত্রুর

হাত থেকে সম্মান বাঁচানোর জন্য আগুনে আত্মাহুতি দিতে চেয়েছিল সুমিত্রা, দ্বিতীয় বার স্বামীর কাছে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই মার্তন্ড দেবের মন্দিরে আশ্রয় নিল। পুরুষের ছত্র ছায়া ছাড়া নারীর আর কোথাও অস্তিত্ব নেই সুমিত্রা তার চরম প্রতিবাদ। সুমিত্রার সহচরী বিপাশার কথায় জানা যায় রাণী কেমনভাবে ছিল রাজবাড়িতে -- রানীকে 'শিকল পরাতে পারে নি, খাঁচায় রেখেছিল। পাখা বাঁধিয়ে দিয়েছিল সোনা দিয়ে। ধরতে গিয়ে তাঁকে হারাল।'[৩৭] রাজার প্রমত্ত আচরণ থেকে কাশ্মীরের প্রজাদের বাঁচাতে, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে সম্মান জানাতে সুমিত্রা দ্বিতীয় বার অগ্নি সজ্জার আয়োজন করে। সতীতীর্থে রাণী মহেশ্বরী আগুনে নিজেকে সঁপেছিলেন স্বামীর অনুমৃতা হয়ে। সতীর মর্যাদা লাভ করাই ছিল তার কাছে নারী জীবনের চরম গৌরবের। সুমিত্রা পাঁচশ বছর পরে আগুনে প্রাণ দিল স্বামীর দাসী হয়ে থাকতে পারল না বলে। আগুনে ঝাঁপানো মেয়েদের গল্প কত পাল্টে গেল রবীন্দ্রনাথের লেখায়। মেয়েদের পরিবর্তিত মানসিকতার টুকরো টুকরো ছবি ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের রচনায়।

উল্লেখপঞ্জি

১. Krishna Kripalani / Rabindra Nath Tagore -- A Biography / Visva -- Bharati / 1980 / P-143
২. রবীন্দ্র রচনাবলী -৫/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ চিত্রাঙ্গদা/ পৃষ্ঠা- ২৭১ /১৯৯২
৩. Bimanbehari Majumdar/ Heroines of Tagore/ Calcutta Firma K.L.Mukhopadhyay /1968 P-149
৪. হুমায়ুন আজাদ/ নারী/ নদী কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত/ ১৯৯২/ পৃষ্ঠা- ১১৪-১১৫
৫. সুতপা ভট্টাচার্য/ সে নহি নহি/ বিশ্বভারতী ১৯৯০/ পৃষ্ঠা- ১৫
৬. মালিনী ভট্টাচার্য/ রবীন্দ্র চিন্তায় ও সৃষ্টিতে নারী মুক্তির ভাবনা/ অনুষ্টুপ প্রবন্ধ সংকলন - বিষয় রবীন্দ্রনাথ - ১৯৯৯/ সম্পাদনা অনিল আচার্য সব্যসাচী দেব/ পৃষ্ঠা- ৪৮
৭. তদেব পৃষ্ঠা- ৪৮
৮. রবীন্দ্র রচনাবলী-৫/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ চিত্রাঙ্গদা/ পৃষ্ঠা- ২৬৪
৯. তদেব / পৃষ্ঠা- ২৬৫
১০. তদেব / পৃষ্ঠা- ২৬৪
১১. তদেব / পৃষ্ঠা- ২৭০
১২. তদেব / পৃষ্ঠা- ২৭১
১৩. উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য/ রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা/ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি/ ১৩৬৬/ পৃষ্ঠা- ১৪৪
১৪. রবীন্দ্র রচনাবলী/ ৫/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ মালিনী/ পৃষ্ঠা- ৩৪৫
১৫. তদেব / পৃষ্ঠা- ৩৪৮-৪৯
১৬. প্রমথনাথ বিশী/ রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ/ ওরিয়েন্ট বুক/ পূনার্ঙ্গ সং ১৯৯৬/ পৃষ্ঠা- ৮৪-৮৬
১৭. Bimanbehari Majumdar\ Heroines of Tagore\ Calcutta Firma K.LM\ 1968\ P-165
১৮. রবীন্দ্র রচনাবলী- ৬/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ রক্তকরবী/পৃষ্ঠা- ১৯৫
১৯. অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়/ টুকরো গদ্য ঃ পৌরুষের দৌড় তে দেখাই যাচ্ছে, এবার সমাজ একটু মেয়েলি হোক/ আনন্দবাজার পত্রিকা/ ২৭ আগস্ট ১৯৯৬
২০. নীহাররঞ্জন রায়/ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা/ নিউ এজ পাবলিশার্স কলকাতা/ ১৩৬৯/ পৃষ্ঠা- ৩৩২
২১. শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায়/ রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক/ এস. ব্যানার্জী ১৩৭২/ পৃষ্ঠা- ১৭৮
২২. তদেব / পৃষ্ঠা- ২০০
২৩. রবীন্দ্র রচনাবলী/ ৬/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ রক্তকরবী/ পৃষ্ঠা- ২৩৪
২৪. Bimanbehari Majumdar\ Heroines of Tagore\ Firma K.L.M\1968\ P-256

২৫. শঙ্খ ঘোষ/ রক্তকরবী ঃ কয়েকটি তথ্য/ অনুষ্টুপ প্রবন্ধ সংকলন- বিষয় রবীন্দ্রনাথ ১৯৯৯/ সম্পাদনা অনিল আচার্য্য সব্যসাচী দেব/ পৃষ্ঠা- ১৪০
২৬. প্রমথনাথ বিশী/ রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ/ ওরিয়েন্ট বুক/ ১৯৬৬/ পৃষ্ঠা- ৫২৪
২৭. তদেব / পৃষ্ঠা- ৫২৫
২৮. রবীন্দ্র রচনাবলী/ ৬/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ বাঁশরি/ ৩৭১
২৯. তদেব / পৃষ্ঠা- ৩৮৫
৩০. তদেব / পৃষ্ঠা- ৩৮৬
৩১. প্রমথনাথ বিশী/ রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ/ ওরিয়েন্ট বুক/ ১৯৬৬/ পৃষ্ঠা- ৫৩০
৩২. রবীন্দ্র রচনাবলী/৬/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ বাঁশরি/ পৃষ্ঠা- ৩৮৭
৩৩. তদেব / তপতী / পৃষ্ঠা-৭৫৪
৩৪. তদেব / পৃষ্ঠা- ৭৫৪
৩৫. তদেব / পৃষ্ঠা- ৭৩৩
৩৬. তদেব / পৃষ্ঠা- ৭৩৩
৩৭. তদেব / পৃষ্ঠা- ৭৭৬

রবীন্দ্রনাথের সৃজনাত্বক রচনার মধ্যে মেয়েদের সমস্যা সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ছোট গল্পগুলিতে। প্রায় শুরু থেকে বাঙালি সমাজ-পরিবারের জীবনের সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর পরিবেশে মেয়েদের জীবনচর্যা কেমন ছিল ছোট গল্পগুলিতে তা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মেয়ে জন্মকে মনে করা হত নিরানন্দের ঘটনা। কোনো কোনো পরিবারে মেয়ে জন্মালে কান্নাকাটি পড়ে যেত এবং জন্মদাত্রীকে নানা কটুবাক্য শুনতে হত। ১২৯৮ -এ লেখা 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমা জন্মে বাবা মার আদর পেয়েছিল। পাঁচ ছেলের পর মেয়ে পেয়ে খুশি হয়েছিল রামসুন্দর ও তার স্ত্রী। তাদের এই খুশি স্থায়ী হয় নি। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় নিরুপমা একটু বড় হতেই তার বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। বিয়ের পণ নিয়ে বর পক্ষের বিশেষ করে বরের মায়ের নিষ্ঠুরতার কাহিনী 'দেওনাপাওনা'। আধুনিক কালে ভদ্র বাঙালির ঘরের এই নির্মম হৃদয়হীনতার পরিচয় সাহিত্যে এই প্রথম।[১] যৌথ পরিবারে বধূ নির্যাতনের জ্বলন্ত নিদর্শন নিরুপমা। শুধু অত্যাচারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ থামেন নি সামাজিক পরিবর্তনের ছাপ যে যুবকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তারও পরিচয় আছে। নিরুপমার শ্বশুর অত্যাচারী কিন্তু তার পুত্র পরবর্তী প্রজন্মের, সে লেখাপড়া শিখেছে পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদের আদর্শে দীক্ষিত তাই বিবাহবাসরে পণ নিয়ে গন্ডগোল বাধলে পিতার অবাধ্য হয়ে বিয়ে করে ফিরেছে। 'বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল', দেখে রায়বাহাদুর হতোদ্যম হলেও এই শিক্ষাই বাঙালি যুবকদের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। পণের বাকি টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ভিটেমাটি হারিয়ে রামসুন্দর ধীরে ধীরে নিঃস্ব হয়ে গিয়েও শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের জন্য সুখ শান্তি নিরাপত্তা কিছুই কিনতে পারে নি। অপরদিকে নিরুপমা তিলে তিলে মৃত্যকে বরণ করেছে। তার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গুছিয়ে বসে স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে তার উত্তরে মার চিঠি পেয়েছে "বাবা, তোমার জন্যে আর একটি মেয়ের সন্মন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।'

এবার বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।"[২] মেয়েদের জীবনের সমস্যার মূল জায়গাগুলি ধরে নাড়া দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১২৯৮ এ লেখা খাতা গল্পে অসম বিবাহ ও বালিকা বিবাহের নির্দয় দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মেয়েদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহকে একেবারেই ভালো চোখে দেখা হয় নি। লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় এই বিশ্বাস প্রচীনদের মনে প্রবল ছিল। রাসসুন্দবী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবীরা কেমন করে লুকিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে পড়াশুনা করেছিলেন সে তথ্য আজ আর কারো অজানা নয়। পড়াশোনার ক্ষেত্রে পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার ছিল- লেখাপড়া শিখে বুদ্ধির চর্চায় পুরুষেরা স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী হওয়ার সুবাদে বাঙালি যুবকেরা প্রথম পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। এবং এই সুযোগের সদব্যবহার করে বুদ্ধি চর্চার প্রধান প্রধান বিষয়ে অগ্রণী একদল মানুষ সারা ভারতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দেশে এবং দেশের বাইরে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সম্মান ও স্বীকৃতি অন্যান্য শিক্ষিত বাঙালি পুরুষদের মনেও আত্মঅহংকারের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল। পৌরুষ এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। তাই মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে বেশি আগ্রহ দেখালে তা ছিল মেয়েদের পুরুষ হয়ে ওঠার চেষ্টার সামিল। এই জন্যে লেখাপড়া জানা মেয়েদের নিয়ে এত ব্যঙ্গবিদ্রূপ। পুরুষেরা কখনোই চাইতো না লেখাপড়া শিখে মেয়েরা তাদের সমান হয়ে উঠুক; এতে তাদের অধিকার ও মর্যাদা হারানোর ভয় ছিল। 'খাতা' গল্পের উমা বাপের বাড়িতে অল্প লেখাপড়া শিখেছিল, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য তার একটা খাতা ছিল। বিয়ের পর বিদ্বান স্বামীর

তাড়নায় তার গোপন আড়ালটুকু ঘুচে যায়। 'উমার লজ্জা ভয় ও অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে নিছক কর্তৃত্বের জোরে তাকে বাধ্য করা হয় তার একান্ত গোপনীয় খাতাটি দেখাতে এবং তারপর আত্মপ্রকাশের এই একমাত্র উপায়টি তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই কাজে তার রাশভারি স্বামীর সহযোগিতা করে তার সমবয়সী ননদরা, যদিও এই একই ব্যবস্থার বলি ।[৩] ন বছরের উমা লিখতে পড়তে ভালোবাসে এই তার অপরাধ । বালিকা বিবাহের পক্ষে ছিল প্রায় সব স্তরের মানুষজন । যৌথ পরিবারের কাঠামো ঠিক রাখতে বালিকা বধূ বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচনা করা হত । 'বালিকা বধূর ভাবমূর্তি' বাঙালি মানসে মোহের সঞ্চার করত। " 'খাতা' গল্পটিকে শুধু লেখকের নারীদরদী মনোভাবের পরিচায়ক বলে দেখলে চলবে না । . . . ঐ গল্পের আসল জোর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক অযুক্তির মূলে যুক্তি দিয়ে আঘাত করবার ক্ষমতায় । বালিকা বধূর পরিচিত রোমান্টিক আদলটিকে এগল্পে ভেঙে চুরে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে দেখানো হয়েছে ।"[৪] একটা অখ্যাত গল্পের মধ্যেও রবীন্দ্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ।

সমাপ্তি (১৩০০) আপাত দৃষ্টিতে শ্বশুর ঘর করতে অনিচ্ছুক দুষ্টু প্রকৃতির বালিকা বধূর যুবতী স্ত্রী হয়ে ওঠার মিষ্টি গল্প । 'রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর প্রথাগত সম্পর্কটি মূলত ক্ষমতার সম্পর্ক ।'[৫] এই ব্যবস্থা অপূর্বর ভালো লাগে নি, সে চেয়েছিল স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্ক গড়তে । নারীর কমনীয়তা নয়, মৃণ্ময়ীর পুরুষালী পাগলী রূপ অপূর্বকে মুগ্ধ করেছিল । সমাজের শাসনকে উপেক্ষা করে, মার ভালো ছেলে হয়ে না থেকে অপূর্ব স্ত্রীকে তার ইচ্ছায় চলতে দিয়েছিল । স্বামীত্বের যে অধিকার সে পেয়েছিল তা দিয়ে অনায়াসে মৃণ্ময়ীকে বশীভূত করতে পারত, কিন্তু সে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করেছিল মৃণ্ময়ীর মনে প্রেমের উন্মেষের জন্য । সমাজ এবং পরিবারের শাসনের সামনে মেয়েদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পুরুষের প্রেমে আশ্রয় খোঁজে । মেয়েদের জীবনে পুরুষের এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ । বিমান বিহারী মজুমদার পরিবর্তনের সূচনা দেখেছেন আর এক ভাবে - "This story is a superb example of Tagore's creative power, but none theless it served an important social purpose in the last decade of the nineteenth century in showing how to win the love of immature girls by tact, patience and human treatment."[৬]

১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শাস্তি' গল্পে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিদামের মুখ দিয়ে একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা উচ্চারিত হয়েছে ঃ 'ঠাকুর বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।'[৭] বউ এর মূল্য কতটুকু এ থেকে তা অনুমান করা যায়। এই কথায় সমাজ মানসিকতার প্রতিফলন থাকলেও নতুনত্ব কিছু নেই । নতুনত্ব আছে চন্দরার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে। স্ত্রীর কাছে স্বামী দেবতা, সেই দেবতা কে চন্দরার মনে হয়েছে স্বামী রাক্ষস। দাদাকে বাঁচাবার জন্য বড় বউকে খুন করার দায় ছিদাম চন্দরাকে স্বীকার করে নিতে বললে চন্দরার 'সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।"[৮] 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের উচ্চবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ মৃণালের অনেক আগে সমাজের নীচু স্তরে কমবয়সী অশিক্ষিত দরিদ্র 'একগুয়ে' মেয়ে চন্দরা স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ফাঁসিকাঠকে বরণ করে নিয়েছিল। স্বামীর কাছে তার মূল্য কতটুকু তা বুঝে যাবার পর তার সমস্ত বিদ্রোহ ঘৃণা অভিমান প্রকাশ পেয়েছিল মৃত্যুর আগে স্বামীকে দেখতে চায় কি না এই প্রশ্নের উত্তরে চন্দরার ব্যবহার করা একটি অনবদ্য শব্দে 'মরণ'।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় অনেক সময় সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব রচনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁকে সমাজ চিন্তকের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী রচনায় তিনি অনেক বেশি স্বাধীন। নারী মনের বিচিত্র ভাবনা তাঁর চরিত্রগুলোর মধ্যে রূপ লাভ করেছে। ১৩০১- লেখা মেঘরৌদ্র গল্পে গিরিবালা নারীর চিরন্তন স্নেহদাত্রী কল্যাণীর ভূমিকা পালন করেছে। বয়সের প্রচুর ব্যবধান সত্ত্বেও সে শশিভূষণের আশ্রয়দাত্রী হয়ে উঠেছে। মাত্র পনের বছর বয়সে বিধবা হয়ে জীবনের সব সুখ সে হারিয়েছে কিন্তু শীর্ণমুখ ম্লান বর্ণ ভগ্ন শরীর শশিভূষণের জীবনের সব অকৃতকার্যতাকে সে স্নিগ্ধ সকরুণ চাইনি দিয়ে মুছে দিতে চেয়েছে। তার সব দায় নিজে নিয়ে বালিকা বয়সের ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যে কল্যাণী মূর্তির ধারণা কবির মনে ছিল গিরিবালা তারই প্রতিরূপ। কয়েক বছর আগে লেখা পোষ্টমাস্টার গল্পের ছোট্ট রতনকে ও এই ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। বিচারক (১৩০১) গল্পের কলঙ্কিনী ক্ষিরোদা লেখকের কলমে দেবী প্রতিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বাল বিধবা হেমশশী যৌবনের তড়নায় মোহিতচন্দ্রের হাত ধরে সুখের ঘরের আশায় গৃহত্যাগ করেছিল। সেইসময়ে কমবয়সী বিধবাদের এই এক অনিবার্য দুর্দশায় মুখে পড়তে হয়েছে বার বার। বিধবা বিবাহ আইন চালু হলেও আমাদের দেশে সুবিধাবাদী কূপমন্ডুকতায় তা খুব বেশি কার্যকর হতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে অনেক ধরনের বিধবা চরিত্র আছে। শুধু সহানুভূতি নয় বিধবাদের বাস্তব অবস্থার উপরও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। একজনমাত্র পুরুষের অনুপস্থিতিতে মেয়েদের জীবনের সব সাধ আহ্লাদ কামনা বাসনা ফুরিয়ে যায় না। বৈধব্য জীবনের কঠোরতার কাছে অসহায় আত্মসমপর্ণ, আবার কখনো সেই জীবনকে মেনে না নেবার জন্য ব্যক্তির তীব্র বিদ্রোহ সবই এসেছে তার লেখায়। ব্যক্তি জীবনে যেমন ছেলের এবং পরিচিতিদের বিধবা বিবাহ দিয়েছেন, তেমনি গল্প উপন্যাসে ও বিধবার পুনর্বাসন পেয়েছে তাঁর হাতে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, সমাজের বেশির ভাগ লোকই 'বিচারক' গল্পের মোহিতমোহন দত্তর মতো ভাবতো 'রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজ পিঞ্জরে একটি কুলনারীর ও অবশিষ্ট থাকিবে না।'[৯] কবি এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। পুরুষ নিজের প্রয়োজনে কুলনারীকে বাইরে বের করে, তারপর তারা নিজের ঘরে ফিরে গেলেও সেইসব নারীরা চিরকালের জন্য অন্ধকারে হারিয়ে যায়। বারবনিতারা সমাজে চিরকালই ঘৃণার পাত্র। কিন্তু অধিকাংশ নারী মতো তারাও সুখী নীড়ের স্বপ্ন দেখে। এইসব মেয়েরাও যৌবনের স্নিগ্ধ সায়াহ্নে 'সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রতিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড়,'[১০] রচনা করবার ইচ্ছা করে থাকে। এ শ্রেণীর নারীর ভাগ্যে তা জোটে না। শরীর ছাড়া আর কোনো পরিচয়কেই সমাজ স্বীকার করে না এইসব মেয়েদের বেলায়। রবীন্দ্রনাথ সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে এদের মধ্যে দেবীত্ব আবিস্কার করেছেন। বিধবা ক্ষিরোদা কমবয়সে মোহিতমোহনের প্রেমের আশ্বাসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। প্রেমিকের প্রতারণায় আজ সে বারবনিতা, সে সময়ের স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছে মোহিতমোহনের দেওয়া একটি সোনার অংটি শত দারিদ্রে ও সে বেচেনি প্রথম প্রেমের চিহ্নটিকে। তার এই নিষ্ঠা মোহিতমোহনের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তার চোখে ক্ষিরোদা প্রেমের নিষ্ঠতায় 'দেবী প্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।'[১১]

নিশীথে (১৩০১) গল্পে মানসিক রোগ গ্রস্থ এক স্বামীর ছবি পাওয়া যায়। দক্ষিণাবাবুর স্ত্রী নিজের জীবন বিপন্ন করে মরণাপন্ন স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, সেই স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে দক্ষিণাবাবু কিছুদিনের মাধ্যই স্ত্রীর পরিচর্যায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। অন্য নারীর প্রতি তার আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে প্রথম স্ত্রী সব বুঝতে পেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে স্বামীকে মুক্তি দিয়ে যায়। আত্মহত্যার পিছনে দক্ষিণাবাবুর প্ররোচনা গল্পে অনুক্ত থাকে নি। এই অপরাধ বোধ শেষ অবধি তাকে মানসিক

রোগীতে পরিণত করেছে । প্রথমা স্ত্রীর আত্মহত্যা জনিত গ্লানি দক্ষিণাবাবু দ্বিতীয় স্ত্রী পেয়েও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি । সমাজ তাকে কোনো শাস্তি দেয় নি, কারণ সমাজের চোখে এটা পুরুষ মানুষের কোনো অপরাধই নয় । সমাজের চোখে না হলেও দক্ষিণাবাবুর বিবেক তাকে দোষী সাব্যস্থ করেছে । প্রথমা স্ত্রী যে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, মৃত্যুর পর তা সে ফিরে পেয়েছে । নারী শুধু সংসারে প্রয়োজনীয় বস্তু না থেকে ব্যক্তি হিসেবে উঠে এসেছে এইসব গল্পে।

'দিদি' গল্পে শশী স্বামী অন্ত প্রাণ 'কারণ স্বামী - সর্বস্ব, প্রিয়তম, স্বামী দেবতা'।[১২] এর অন্যথা হতে পারে একথা তার কল্পনাতে ও ছিল না । কিন্তু বেশি বয়সে পাওয়া অকালে পিতামাতাহীন একটা ছোট ভাইকে কেন্দ্র করে স্বামীর স্বরূপ সে জানতে পারল । অনাথ নাবালক ভাইকে ফাঁকি দিয়ে জয় গোপাল সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নিলে শশীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। একজন ঘরোয়া গৃহবধূর পক্ষে পরপুরুষের সামনে বের হওয়া তখনকার দিনে রীতিমত সাহসের কাজ । শশী স্বামীর বিরোধিতা করে একেবারে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে জয়গোপালের কান্ডকারখানার কথা জানিয়ে নিজের ভাইকে তার হাতে সমপর্ণ করে বাড়ি ফিরল । সে নিশ্চিত জানতো এত বড় কাজ করে সে কোন মৃত্যুপুরীতে ফিরছে । স্ত্রীরা স্বামীর সব অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতেই অভ্যস্থ ছিল -- প্রতিবাদ তো দূরের কথা । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীচরিত্র শশী শুধু বিরোধিতাই করে নি, নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রতিকারও করেছে । 'শাস্তি' গল্পে চন্দরা স্বামীর কাজের প্রতিবাদ করেছিল জীবন দিয়ে প্রতিকার করতে পারে নি, 'দিদি' গল্পের শশী আরো এক ধাপ এগিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার করতে পেরেছে।

মানভঞ্জন (১৩০২) গল্পটি এই পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প বলে মনে হয়েছে । ধনী পরিবারের ছেলে গোপীনাথ পিতার মৃত্যুর পরে কাঁচা টাকার মালিক হয়ে দোস্ত জুটিয়ে বেপরোয়া জীবনযাপন করে, থিয়েটারের মেয়েদের পিছনে সময় কাটায়। ঘরে তার অসামান্য সুন্দরী স্ত্রী গিরিবালা নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। তখনকার দিনে ধনীর ঘরের স্ত্রীদের এই ছিল সাধারণ চিত্র। স্বামীরা বাইরে যেমন খুশি দিন কাটাবে, স্ত্রীরা ঘরে বন্দী থেকে জীবনের সকল স্বাদ আহ্লাদে বঞ্চিত হবে। এই পরিচিত পরিবেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ গল্পটাকে নিয়ে গেলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায়। এই গল্পে গিরিবালার রিআক্শন্ একেবারে আধুনিক নারীর মতো। রবীন্দ্রনাথ একইসঙ্গে দুটো ক্ষেত্রে নায়িকাকে দিয়ে বিদ্রোহ করিয়েছেন। এক, গিরিবালা স্বামীর উপেক্ষার জবাব দিয়েছে; দুই, সে এমন জীবন বেছে নেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে যা সেই সময়ে শুধু নয় প্রায় সবসময়েই সামাজিক দৃষ্টিতে সমালোচনার বিষয় হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী এবং সমাজ উভয়কেই উপেক্ষা করবার শক্তি গিরিবালার মধ্যে ছিল। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত নারীরাই পুরুষের অত্যাচার অবহেলার শোধ সব সময় নিতে সমর্থ হয় না, সেখানে অল্প শিক্ষিত ধনীঘরের গৃহবধূ বাইরের জগৎ সংসার সম্পর্কে যার কোন ধারণাই প্রায় নেই সেও উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার স্পর্ধা দেখাতে পারে স্বামীর অবহেলায় গৃহ ত্যাগ করে এটাই আশ্চর্য। গিরিবালা রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাচ গান অভিনয় সবকিছু আয়ত্ত করে রঙ্গমঞ্চের সেরা অভিনেত্রী হয়ে উঠেছে। একদিন সে তার রূপ যৌবন ভালোবাসার নিষ্ঠা দিয়ে স্বামীকে জয় করতে পারেনি, এখন সে অভিনেত্রী হিসেবে বহু পুরুষের মনোযোগ প্রশংসা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এর আগের গল্পে দেখেছি স্বামী দেবতার বিরোধিতা করে মেয়েরা মৃত্যুবরণ করেছে সংসার ত্যাগ করেছে। কিন্তু গিরিবালা স্বামীকে ত্যাগ করে শুধু বেঁচেই থাকল না, স্বাধীন জীবনে সম্মান ও প্রশংসা অর্জনেও সমর্থ হল। আরো একটা বিষয় লক্ষ করবার সে সময়ে থিয়েটারের মেয়েদের সামাজিক অসম্মানের দায় বহন করতে হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাচ গান অভিনয় কলাকে জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্র বলে মনে করতেন। এবং গিরিবালার

অভিনেত্রী জীবন নিয়ে একটিও বিরূপ মন্তব্য করেন নি। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গিরিবালার এই বিদ্রোহ 'স্ত্রীর পত্র'-র মৃণালের চেয়ে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু গিরিবালা লেখাপড়া শেখেনি সে তার নিজের কথা মৃণালের মত চিঠি লিখে জানাতে পারেনি, বলতে পারে নি তার বঞ্চিত জীবনের কাহিনী। তবুও তার যে কিছু মূল্য আছে সে কথা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে। আরো বড় কথা মেয়েদের জীবন-ধারনের যে সব বিশুদ্ধ পন্থা আছে তা পরিহার করে অভিনেত্রীর জীবন বেছে নিয়ে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছে। বাইরের জগতে বের হতে এবং সেই বাস্তবতার মোকাবিলা করতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

উদ্ধার (১৩০৭) গল্পে আর এক বিদ্রোহিনীকে দেখা গেল। A sign of revolt against the suspicious husband is noticeable in Gauri, of the story entitled the saved.[১৩] তখনকার দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর প্রতিবাদ এসেছে সংসার কে অস্বীকার করে ধর্মকে অবলম্বন করার মধ্যে দিয়ে। স্বাধীন ভাবে থাকবার জন্য অন্য কোনো উপায় অবলম্বনের মতো উপযুক্ত পরিবেশ, জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনের সুযোগ তখনো সে ভাবে সৃষ্টি হয় নি। এখানেও স্বামীর কাছে প্রেমের পরিবর্তে সন্দেহের শিকার হয়ে গৌরী গুরুদেবকে অবলম্বন করে ধর্মপথের যাত্রী হয়েছে। গৌরীর নিজের মধ্যে ফাঁকি ছিল না বলে গুরুদেবকে জড়িয়ে তার স্বামী কুৎসা রটনা শুরু করলে অপমানিত গৌরী সংসার ত্যাগ করে সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করার জন্য গুরুদেবের আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। গুরুদেবের সম্মতি পত্র স্বামীর হাতে পড়বার পর তার স্বামী আপোপ্লেক্সিতে মারা গিয়েছে। Despite this mishap the Guru came to the place of assignment at that appointed hour. Gouri at once realised what a fall his had been ... life lost all purpose and meaning when she found how bad men were.[১৪]

এর পর গৌরী বিষ খেয়ে অত্মহত্যা করে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেছে। আধুনিক কালে এই সহমরণের দৃষ্টান্তে সকলে স্তম্ভিত গেল ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গড়লেন পুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক নারী চরিত্র যে প্রচলিত প্রথায় স্বামী গুরু কাউকেই দেবতা ভাবেনি, পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করে নি। এই আত্মহত্যা তার প্রতিবাদ।

'প্রতিবেশিনী' গল্পে একটি বালবিধবা দুই বন্ধুকে কাব্য চর্চার প্রেরণা জুগিয়েছে। 'আমি' নামক চরিত্র টি শুধু কবিত্বই করে নি বাল বিধবার সামাজিক অবস্থাকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করে বন্ধুকে বলেছে, ''বৈধব্য লইয়া তুমি তো দূর হইতে দিব্য কবিত্ব করিতে চাও, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙক্ষাপূর্ণ মানব হৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে, সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য।''[১৫] সমাজে তখনো বিধবা বিবাহ সড়গড় হয় নি খানিকটা ব্যতিক্রম হিসাবেই রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকচ্ছলে এক বাল বিধবাকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর কাব্য প্রতিযোগিতা দেখিয়ে এক জনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন অপরজন হতাশ প্রেমিক। বালবিধবারও যে স্ত্রী হিসেবে এত মূল্য আছে এর আগে সে কথা কে জানত? 'দর্পহরণ' (১৩০৯) গল্পের নির্ঝারিণী' বারো বছর বয়সের বালিকা বধূ। ঐ বয়সেই সে পিতৃগৃহে সংস্কৃত বাংলা উত্তম রূপে শিক্ষা করেছিল। রবীন্দ্রনাথও নিজের মেয়েদের বিদ্যালয়ে না পাঠালেও বাড়িতে ভালোভাবে সংস্কৃত বাংলা ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন কি বিবাহের পরও যাতে পড়াশোনা ব্যহত না হয় সে দিকে খেয়াল রেখেছিল। 'নির্ঝরিণী'র বাংলা জ্ঞান নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও তার স্বামী শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর লেখক সত্তাকে মেনে নিয়েছে। মেয়েরা সমাজে পরিবারে এ ধরনের স্বীকৃতি পেতে

শুরু করেছিল রবীন্দ্রনাথের গল্পে তারই নিদর্শন। 'হৈমন্তী' (১৩২১) গল্পের চরিত্র টি অত্যন্ত মর্যদা সম্পন্ন একটি মেয়ের। বাংলাদেশের প্রচলিত জীবনধারার বাইরে মানুষ হবার সুযোগে সে হয়ে উঠেছে অন্যরকম। তার জীবনে ট্র্যাজেডির কারণ তার উন্নত স্বভাব। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলতে তার রুচিতে বাধে। কচি খুকি সাজবার মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবণতাকে তার মনে হয় অস্বাভাবিক। সেই কারণেই, she persecuted by her mother-in-law because she refused to conceal her true age.[১৬] চাহিদা অনুযায়ী পণ এবং অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া সত্ত্বেও হৈমন্তীর ঋষিতুল্য পিতাকে যথেষ্ট ধনী না হওয়ার অপরাধে অপমানিত হতে হয়েছে; "How the brides father was ill treated and even insulted when he came to see his daughter are illustreated in the stories Dena Paona and Haimanti." মেয়েদের নিজস্ব রুচিবোধ শিক্ষা সহবত অনেক সময় শ্বশুর বাড়িতে তাদের একঘরে করে দিত। কেননা মেয়েদের কোনো স্বতন্ত্র রুচি থাকবে না, তারা হবে জলের মতো যে পাত্রে রাখবে তেমন আকার নেবে। নতুন যুগের ছেলে হৈমন্তীর স্বামী বুঝেছিল, "দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো আনা বাকী থাকিয়া যায়। . . . অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহ মাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই।"[১৮] শশুর বাড়ির অবহেলায় হৈমন্তীর মৃত্যু তার স্বামী ঠেকাতে পারেনি, এমন কি বাবা মার চাপে নিজের দ্বিতীয় বিয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিতে পারে নি। কিন্তু যা পেরেছে তাও কম নয়। সংসারে স্ত্রীর নিজস্ব যে মূল্য আছে, সে যে সম্পত্তি নয়, সম্পদ এই কথাটা জানিয়ে দিতে পেরেছে। অসহায় পিতার বেদনায় কবির নিজের অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে মনে হয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁচড়ে মেয়েদের স্বাধীন অস্তিত্বকে মূল্য দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পকর্মে।

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো সবচেয়ে সজীব আধুনিক এবং বহুমুখী উজ্জ্বলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর ছোট গল্পগুলোতে। মেয়েদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর মতামত শিখর স্পর্শ করেছে স্ত্রীর পত্র (১৩২১) গল্পে। এই গল্প মেয়েদের সমস্যাকে এতটাই প্রকট করে তুলেছে যা আজকের দিনে ও অতিপ্রয়োজনীয়। "নারী জীবনের যে দুর্বিসহ দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পৌনে এক শতাব্দী পরে সেই কথাই আমরা বলছি। এবং এই সমাজকে আঘাত করতে কবি যে রকম নির্মম রূঢ় শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে বিরল।"[১৯] বিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয়তম নারী স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল। "নারী মুক্তির যে প্রশ্নটা আজ সর্বত্র শোনা যাচ্ছে, সেটা স্ত্রীর পত্রে এমন বাস্তব, বাহুল্য বর্জিত ভাবে আছে যা আর কোথাও নেই। অত্যন্ত পজিটিভ চরিত্র এই মৃণাল। সে মেনে নিচ্ছে না চিরাচরিতকে, তার লক্ষ্য আপন সত্তার প্রতিষ্ঠা। আমার সমকালীন নারীর মধ্যে যে জিনিসটা আমি দেখতে চাই, সেটি পাচ্ছি মৃণালের মধ্যে। কতকাল আগে রবীন্দ্রনাথ এমনি একটি চরিত্র আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছেন ভাবলে বিস্ময় লাগে।"[২০]

স্ত্রীর পত্রে মেয়েদের সমস্যার দুটো দিক আছে এক, ব্যক্তিসত্তার সমস্যা, দুই বিবাহিত জীবন বা সামাজিক জীবনের সমস্যা । মৃণালের ব্যক্তিসত্তার সমস্যা গভীরতর হয়েছে বড় জায়ের বোন অসুন্দরী অবহেলিত বিন্দুকে আশ্রয় দিতে গিয়ে । কারণ তার নিজের মধ্যে ছিল আত্মমর্যাদা বোধের স্বতন্ত্র্যতা। মেয়েদের বোধবুদ্ধি- হীনতা এতটাই স্বাভাবিক বলে মনে করা হত যে মৃণালের বুদ্ধিটাই ব্যতিক্রম মনে হয়েছে সংসারের কাছে । "আমার যে রূপ আছে, সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি । কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে । ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে উদবিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে

মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই।'[২১] মেয়েলি আবেগ দিয়ে নয় বুদ্ধি দিয়ে সংসারে মেয়েদের অবস্থান বুঝে নিতে চেয়েছে মৃণাল। সে জানত সংসারে অনাদরে অভ্যস্থ মেয়েরা। 'আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়।'[২২] দুঃখ অপমান লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচতে মেয়েরা মৃত্যুর আশ্রয় নেয়, মৃণালের যুক্তিবোধই প্রতিবাদ জানিয়েছে মৃত্যুর মত সহজ পরিণতি মেনে নেবার বিরুদ্ধে। 'বাঙালির মেয়েতো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু এমন মরার বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।'[২৩] প্রতিরোধহীন সংসারে অবাঞ্ছিত বিন্দু কোথাও ঠাঁই না পেয়ে পাগল স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরেছে। মৃণাল নারীর নতুন জেগে ওঠা অস্তিত্ব যে মরতে চায় না ওটা সহজ কাজ বলে। সে জোরের সঙ্গে জানিয়ে দেয় 'আমিও বাঁচব।'

নারীর স্বাধীন সত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদার দায় বড় জিনিস। নারী হিসেবে আত্মমর্যাদা বোধ কত প্রবল হলে অনাত্মীয় নিরাশ্রয় একটা মেয়ের অকাল মৃত্যুতে সুখীগৃহকোণ ছেড়ে এমন কি নারী জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বামীকেও ছেড়ে পথে বেড়িয়ে পড়তে পারে। মৃণালের সেই অসামান্য উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের ভাষার তীব্রতায় ছুঁয়ে যায় একালের মেয়েকেও -- ''দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়, তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি।''[২৪] চরিত্রহীন স্বামীও যে সমাজে দেবতার মর্যাদা পায়, সেখানে চরিত্রবান ধনী রূপবান স্বামীকে তো মৃণালের মাথায় করে রাখবার কথা। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের দুঃখের নতুন সংজ্ঞা আবিষ্কার করলেন। এর মূল্য কি অসামান্য মেয়েদের কাছে। মৃণালের ভাবনা নিজেকে নিয়ে নয়, মেয়েমানুষ জাতটাকে নিয়ে। এতদিন মেয়েদের দুর্দশা নিয়ে পুরুষেরা ভেবেছে তাদের জন্য পথ নির্দেশ করেছে। কিন্তু মেয়েরা যতদিন নিজেদের কথা নিজেরা না ভাবতে শিখবে তাদের দুরবস্থা দূর হবে না। মৃণালের মধ্যে পাওয়া গেল সেই দৃঢ়চেতা মেয়েটিকে আর তার মুখে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত তীক্ষ্ণ মন্তব্য ঃ ''আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি আর আমার দরকার নেই।''[২৫]

একালের নারীও মৃণালের অবস্থানটিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন--''মৃণাল সিদ্ধান্তে এসেছে কোনও বাধ্যবাধকতায় নয়। তাকে কেউ সাহায্য করছে না। এ তার একক সন্ধান। বিন্দুর মধ্য দিয়ে সমগ্র নারীজাতিকে সে দেখেছে। সে উপলব্ধি করেছে, বিন্দুর অসম্মান, মনুষ্যত্বেরই অসম্মান।''[২৬] মৃণালের জেগে ওঠার ব্যাপারটা ছিল নিজের ভেতর থেকে সমাজ-পুরুষমানুষ-সংসার কারো চাহিদা পূরণ করবার জন্য নয়। মেয়েদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেয়েদের প্রতিবাদ এগল্পকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। বিমানবিহারীর ভাষায় ঃ "She wants to assert the elementary rights of woman."[২৭] মৃণালের প্রতিবাদী চরিত্রের পাশে তার আর একটি পরিচয় অনেকখানি আড়ালে চলে যায় সে প্রসঙ্গের উল্লেখ না করলে মৃণালের চরিত্রের যুক্তিক্রম লঙিঘত হয়। ''আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাশ যাইহোক না, সেখানে তোমাদের অন্দরম হলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি, সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজ বউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতে পার নি, আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।''[২৮] মেয়েদের মধ্যে সৃজনশীলতার অভাবের

কথা রবীন্দ্রনাথ কতভাবে কতবার বলেছেন। ঘরসংসারই নাকি মেয়েদের যথার্থ জায়গা, প্রেমই তাদের জীবনের ধ্রুবতারা -- নিয়ন্ত্রক শক্তি। কিন্তু তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন মেয়েদের সৃজনশীলতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে শুকিয়ে যায়। শেষের দিকের প্রবন্ধে এই কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। গল্পগুচ্ছের কোনো কোনো গল্পে কবি-শিল্পীস্বভাবী মেয়েদের কথা ঘটনাচক্রে চলে এসেছে। পুরুষের ভিতরকার শিল্পীসত্তা যেমন অ্যাভারেজ পুরুষদের থেকে শিল্পীকে পৃথক করে দেয়, মেয়েদের মধ্যে রয়েছে তেমন সম্ভাবনা। শিল্পীস্বভাবী মেয়েরা সংবেদনশীল মন নিয়ে সংসারে পাঁচজনের থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। "কিন্তু কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ সংসারজীবনে বাঁধা নারীর পক্ষে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের অস্তিত্ব বা উদয় অসম্ভব, যতক্ষণ না তার মধ্যে সমস্ত সমাজের অসাম্যের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নারী সমস্ত সংসারের মধ্যে সবচেয়ে বদ্ধ জীব, কতগুলি সাংসারিক ভূমিকার সমষ্টি মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর পুরুষের কাছে ব্যক্তিসত্তা যদি আত্মকেন্দ্রিকতার চেহারা নিয়ে আসে, নারীর কাছে তার উন্মোচন হয় কঠিন প্রতিরোধ পেরিয়ে, সমস্ত সংসার-সমাজ-ধর্মনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।"[২৯]

মৃণাল নিজের কবির পরিচয়কে খুব বড় করে দেখেছিল, সেটাই ছিল তার আসল আমি। কারণ সাংসারিক সংকীর্ণতা জটিলতার বাইরে তার নিজস্ব এই বৌদ্ধিক জীবনই ছিল তার শক্তির উৎস। বাস্তবে মেয়েদের জীবনে এমন ঘটনা বিরল নয় যে কবিতা লিখতে পারে বলেই একজন মেয়ে জীবনের অনেক বড় সংকট কাটিয়ে উঠবার শক্তি পায়। শিক্ষা এবং বুদ্ধি চর্চা মেয়েদের চিন্তার স্বাধীনতা দেয় -- এই পথেই তাদের মুক্তি। স্ত্রীরপত্র লেখা হয়েছিল১৯১৪-এ, এর প্রায় ছ'বছর পরে এমন একজন নারীর জীবনকথা জানতে পারি যিনি মাত্র তেইশ চব্বিশ বয়সে জীবনের সবচেয়ে দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন কবিতাকে অবলম্বন করে। কোচবিহারের রাজপরিবারের বধূ নিরূপমা দেবী কেশব কন্যা সুনীতি দেবীর পুত্র বধূ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যে বাদ সেধেছিল রাজবাড়ির পরিবেশ। তাঁর আত্মকথার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "আমার আদর্শের উপরে আঘাত আসছিল-- তার ভিতর থেকেই আমি নিজের অগোচরে শক্তি অর্জন করছিলাম। আত্মীয় বন্ধুদের উপদেশের বিরুদ্ধে,সংস্কারের বিরুদ্ধে এমন কি সমস্ত রকম নিন্দা ও ধিক্কারের বিরুদ্ধে আমায় একা লড়তে হবে --- জয়ী হতে হবে -- আর যদি দরকার হয় মৃত্যুও বরণ করতে হবে।

. . . ভেঙে চুরে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল, হাল ভেঙে গেল, পাল ছিঁড়ে গেল, রসাতলে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমায়, কিন্তু তার মাঝেও আমার কবিতা আমায় ছাড়েনি। যখন আমার পুরনো ঘর ছাড়তে হল আমায় ডুবতে দেয় নি আমার কবিতা, মৃত্যুর আবর্ত থেকে ভাসিয়ে রেখেছিল আমার কবিতা, আমার জীবনের দিক নির্ণয় করল আমার কবিতা।"[৩০] এই অংশ পড়ে মনে হয় মৃণাল যদি কখনো আত্মজীবনী লিখত তবে সেও হয়তো এমন স্বীকারোক্তি করত।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের আরো একটা বৈশিষ্ট্য হল মৃণালের নিজের জবানিতে এটি লেখা হয়েছে। "অর্থাৎ এখানে লেখক সরাসরি আর নারীর সম্বন্ধে নিজস্ব চিন্তা বা বোধ ব্যক্ত করতে চাইছেন না, নারীর ভূমিকার মধ্যে নিজের লেখকসত্তাকে একাকার করে দেবার চেষ্টা করছেন। নারীর কণ্ঠস্বর বাচন ও লেখনভঙ্গি আয়ত্ত করে যেন তার ভূমিকা, তার মন ও শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ার প্রয়াস করেছেন। . . . নারী চরিত্রেরা এই আত্মকথনের ভেতর দিয়ে নিজেদের সামাজিক সাংসারিক ও মানবিক ভূমিকা খুঁটিয়ে দেখে একটা নতুন কোনও বোধে উত্তীর্ণ হতে চায়।"[৩১]

পিতৃত্ববাদের ধারণা সনাতনী হিন্দুত্বের পুনরুত্থান সমাজের ভিতরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিকতায় অজস্র পিছুটান কাজ করেছে মেয়েদের স্বধীনতার প্রশ্নে। এর মধ্যে থেকেও কালের প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আগামী দিনে নারীর আত্মপরিচয় উন্মোচনের সংকট এবং সংগ্রামের অনিবার্যতাকে সমাজ রাষ্ট্র পরিবার কোনো শক্তিই দমিয়ে রাখতে পারবে না। প্রায় শতবর্ষের কাছাকাছি সময়ের ব্যবধানে পৌঁছেও মৃণালের মতো চরিত্রের আবেদন দিন দিন নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। সম্প্রতি দেশে লেখা একটি প্রবন্ধে তনিকা সরকার মৃণালের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন। ''মৃণাল কিন্তু স্বনির্মিত। মৃণাল এক অন্য ইতিহাসের স্বাক্ষর, যে ইতিহাসে বাঙালি মেয়ে নিজের কথা নিজের মুখে বলে, নিজের মতো প্রতিবাদ করে, নিজের কর্মজগৎ অন্য অনেক অসহায় মেয়ের মধ্যে বিস্তৃত করে দেয়। নিজস্ব রাজনীতির পথ তৈরি করে। অনেক বাধা, দ্বিধা, অনেক আপস ও পশ্চাদপসরণ, অনেক স্ববিরোধ থাকেই তবু বিশ শতকের গোড়ায় মেয়েদের এই আধুনিক, নতুন জগৎ, ভূমিকা, কর্মরূপ অনস্বীকার্য।

তাই মৃণালের কথা রবীন্দ্রনাথ তার নিজের পুরুষ লেখক সত্তার আবরণে ঢেকে ফেলতে সাহস করেন নি, তার চরিত্র আগাগোড়া নিজের কথা বলে। কারণ মৃণাল কোন ও পুরুষের ইচ্ছার আদর্শের, সংগ্রামের ফল সমষ্টি বা পরিণাম নয়।

তাই বিন্দু মরে বাঁচে এবং সেই মরাকে মৃণাল সম্মান করে। কিন্তু মৃণাল মরে না, মরতে চায় না। সে বরঞ্চ প্রথম বারের মতো জন্মায় -- সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলি থেকে পালিয়ে নীল সমুদ্রের ধারে, আষাঢ়ের মেঘ পুঞ্জের নীচে। এক যৌথ প্রতিবাদের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস তাকে এনে দেয় নিজস্ব বুদ্ধি, ব্যক্তিসত্তা। সেই ইতিহাস তাকে শেখায় মেজ বউকে পেছনে ফেলে, বিন্দুর মৃত্যুর পথ থেকে সরে এসে নিজের ভরসায় বেঁচে থাকতে। জীবনের সঙ্গে লেগে থাকতে -- সে জীবন যতই বিরুদ্ধ হোক না কেন। 'এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম'।''[৩২] অন্য ধাতুতে গড়া মৃণাল। সে কবি সে প্রতিবাদী সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে ভয় পায় না, সে সাহসী। আধুনিক কালের মেয়েরা তার কাছ থেকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধের পাঠ নিতে পারে।

'স্ত্রীর পত্র'র পরবর্তী পর্যায়ে বেশির ভাগ গল্পের বৈশিষ্ট্য হল স্ত্রী চরিত্ররা আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। নারীর ট্রাডিশনাল ভূমিকা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। অপরিচিতা (১৩২১) একটি শিক্ষিত মেয়ের কাহিনী। যার চারিত্রিক দৃঢ়তায় মেয়েদের সবচেয়ে বড় যে দুর্বলতা যে কোনো ভাবেই হোক বিবাহ বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে সমাজ সংসারকে আপাত স্বস্তি দেওয়া; এই মানসিকতাকে সে জয় করতে পেরেছে। বাংলাদেশের পরিবেশ থেকে দূরে পশ্চিমে মানুষ হয়েছে কল্যাণী; মাতৃহীন সংসারে পিতার উদার মানসিকতা তাকে গড়ে তুলেছে ভিন্নভাবে। তাই বিয়ের রাতে স্যাঁকরা ডেকে পাত্রপক্ষ গহনার হিসেব বুঝে নিতে চাইলে পিতা পুত্রী দুজনেই লগ্নচ্যুত হবার অমঙ্গলকে মেনে নিয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না। অবমাননায় মহার্ঘ পাত্রের সুখী স্ত্রী হবার চেয়ে দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার সাহস দেখাতে পারে কল্যাণী নামের মেয়েটি। এতদিন মেয়েরা অপেক্ষা করেছে প্রেমের জন্যে, তাতে জীবন উৎসর্গ করেছে, সমাজ এই গল্পে অভ্যস্থ ছিল। এখানে উপেক্ষিত পাত্র এ যুগের আলোকপ্রাপ্ত সাতাশ বছরের যুবা প্রেমকে আবিষ্কার করেছে নতুন চোখে। তাই ভেঙ্গে যাওয়া বিয়ের পাত্রীকে হঠাৎ খুঁজে পেয়ে নিজের নিষ্ক্রিয়তার প্রায়শ্চিত্ত করতে ''মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ- আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর

সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি, শম্ভুনাথ বাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, 'আমি বিবাহ করিব না'।''[৩৩] কারণ কি, না ''সেই বিবাহ ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।''[৩৪] সুবিধে পেলে সেই যুবা তার সঙ্গে বিয়ে না হওয়া মেয়েটির কাজ করে দেয়, মেয়েটি তা গ্রহণ করে। তাতেই ছেলেটির মনে হয় -- ''ও গো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না, কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।''[৩৫] নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ মেয়েরা পুরুষদের থেকে মর্যাদা এবং মনোযোগ পেতে চলেছে এ গল্পে তারই ইঙ্গিত।

পয়লা নম্বর (১৩২৪) অনিলা নামে এক গৃহবধূর কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের অনেক নারী চরিত্রের বিশিষ্টতা হল তারা আপন মর্যাদা বিষয়ে সচেতন। কখন কোন ঘটনায় তারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে আগে থেকে তা অনুমান করা যায় না। আপাত শান্ত স্ত্রী অনিলার উপস্থিতি গল্পের কাঠামোয় প্রথম দিকে তেমন নজরে পড়ে না। বিপরীত স্বভাবের দুই পুরুষ চরিত্রের দাপটে সে আড়ালেই থাকে।

জ্ঞানচর্চার আত্মম্ভরিতায় তার স্বামী অদ্বৈতচরণ ছোট একটা গুণমুগ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে। বাইরের বিশাল পৃথিবী তো দূরস্থান তার নিজের সংসারও জ্ঞানচর্চার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। তার জ্ঞানচর্চার সখ মিটিয়ে হ্যাংলা কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট চেটে তার আর অনিলার সংসার চলত। এ নিয়ে অনিলার কোনো ক্ষোভের কথা নেই গল্পে। কিন্তু তাদের আট বছরের পুরনো দাম্পত্যের শূন্য স্থান চোখে পড়ত অনিলার ভাই সরোজের প্রসঙ্গে। পিতৃহারা এই ভাইটির দায় পড়েছিল অনিলার উপর। এবং ঘরে পন্ডিত স্বামী থাকা সত্ত্বেও ভাইকে মানুষ করা বিষয়ে অনিলা তার সঙ্গে কোন দিন আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করে নি।

আর এক দিকে আছে প্রাণ প্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল ধনবান নারীপূজক সীতাংশু মৌলী। উল্টোদিকের বাড়িতে এসে সে আবিষ্কার করেছে অনিলাকে। ''আমি তোমাকে দিখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে -- আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে।''[৩৬]

একটা কাগজকে দু টুকরো করে একই বয়ানে দুটো চিঠি পাবার আগে পর্যন্ত অনিলার উপস্থিতি বোঝা যায় নি। অনিলার ছোট ভাই পরীক্ষায় ফেল করে বিমাতার গঞ্জনা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনাই সব আড়াল সরিয়ে তাকে পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছে। সীতাংশু মৌলী এই বিপদে তাকে সাহায্য করেছে, পুলিশি ঝামেলা মিটিয়ে মৃতদেহ দাহ করতে। অন্যের কাছ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ খবর জেনেছে তার স্বামী। প্রশ্ন করলে অনিলা শুধু চোখ তুলে তাকিয়েছে; তারপর যথারীতি স্বামীর সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য ভোজের ব্যবস্থায় লেগে পড়েছে। অনিলার এই সংযত আচরণ তার চরিত্রের গভীরতা কে প্রতিফলিত করেছে। তার স্বভাবের মত সংযত ছোট্ট চিঠি লিখে সেই রাতেই কপর্দকহীন অবস্থায় গৃহত্যাগ করেছে সে। স্বামী এবং প্রেমিককে একই কাগজের দু টুকরোর সংক্ষিপ্ততম চিঠিতে জানিয়েছে, ''আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।''[৩৭]

রবীন্দ্রনাথ দেখান অনিলার অনুপস্থিতিতে জ্ঞানগর্বী স্বামীর পান্ডিত্যের আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়। প্রেম শুধু নারীর প্রবৃত্তি নয়, ''যে ছিল স্ত্রী পরিচয়ে সেবিকা, সে এবার হয়ে উঠল অপ্রাপনীয়া প্রেমিকা।

সীতাংশু মৌলীর রোমান্টিক কল্পনায় (তার চিঠিগুলি) সে আপনার হৃদয় প্রকাশের পথ খুঁজে পেল।''[৩৮] স্বামীর গাঢ় গভীর অনুশোচনায় অনিলা নামে মেয়েটি মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

'পাত্র ও পাত্রী' (১৩২৪) গল্পে শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার বাঙালি ঘরে স্ত্রীর ভূমিকা কি ছোট বয়সেই বুঝতে শিখে গিয়েছিল বাবা মাকে দেখে। --''সেই বালিকার রূপগুণের টান সেদিন আমার উপরে পৌঁছায় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল।''[৩৯] স্ত্রীকে নিয়ে কল্পনায় কিশোরটি যে ছবি এঁকেছিল তাতে মধুর রস অপেক্ষা কিভাবে স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করবে এবং বিনা দোষে তাকে কষ্ট দেবে সেই ভেবেই তার মন খুশি হয়ে উঠেছিল। এমনই ছিল বাঙালি ঘরের পুরুষের মূল্যবোধ যা ওইটুকু ছেলেকে ও রেহাই দেয় নি।

রবীন্দ্রনাথের গল্প এখানে থেমে থাকে নি, যুবা সনৎ কুমার নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে যখন স্ত্রী নির্বাচন করতে চায় বাবার ঠিক করা শুচিবায়ুগ্রস্ত পাত্রী বিয়ে করতে রাজী হয় না। ততদিনে তার শিক্ষা তার মনে স্ত্রী সম্বন্ধে নতুন ধারণা তৈরি হয়েছে, ''স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্য নয়, তার বুদ্ধিও থাকা চাই।''[৪০]

সনৎ কুমার আর বিয়ে করে উঠতে পারে নি। মধ্য বয়সে পৌঁছে একাকীত্ব কাটানোর জন্য নিজেই উদ্যোগী হয়ে পাত্রী নির্বাচন করেছে। কিন্তু সেই পাত্রী দীপালির আবার প্রেমিক ছিল। দীপালির মার জাত সমাজে জলচলের যোগ্য ছিল না। এর আগেও দেনা পাওনা, অপরিচিতা প্রভৃতি গল্পে পাত্র পিতামাতার নিষেধাজ্ঞাকে অপছন্দ করলেও সক্রিয় প্রতিবাদ সময়মত করতে পারে নি। শেষের দিকের এই গল্পে শ্রীপতি সমাজের, বাবার অর্থসম্পদ কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে প্রেমিকাকে বিয়ে করতে পেরেছে। আর তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে একদা স্ত্রী জাতিকে অবহেলার চোখে দেখতে অভ্যস্থ সেই পরিবর্তিত মানুষ সনৎ কুমার। পরিণত বুদ্ধিতে যিনি ভাবতেন,''পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্ধক্যে নাতনি, নাতবউ। এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়।''[৪১] সেই পূর্ণতা সনৎ কুমারও পেয়েছিল নিজে বিয়ে না করে দীপালি ও শ্রীপতির বিয়ে দিয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে। সংসারে পূর্ণতা প্রাপ্তির কথা এতকাল ধরে বলা হত মেয়েদেরই বিশেষ আকাঙক্ষার বস্তু, এখানে দেখা গেল এই চাহিদা পুরুষের মনেও থাকতে পারে।

চিত্রকর গল্পের মুকুন্দবাবু পেশায় উকিল এবং চিত্রকলার কিছুই বোঝে না। কিন্তু তারই প্রশ্রয়ে স্ত্রী সত্যবতী সংসারের অন্য লোকের কটাক্ষ উপেক্ষা করে ঘরের কাজে অবহেলা করে অনাবশ্যক খেয়ালে শিল্পচর্চা করতে পারত। ''সত্যবতী মনে নিশ্চিন্ত জানতেন, বাংলাদেশের আর কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রশ্রয় আশা করতে পারতেন না। শিল্প সাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না।''[৪২] আপন খেয়ালে থাকতে চাওয়া নারী-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শিল্পী সত্তার উন্মোচন এবং তার প্রতি দরদ কবি রবীন্দ্রনাথেরই।

চোরাই ধন (১৩৪০) গল্প হয়তো সেই অর্থে নারী বিষয়ে নয়। কিন্তু স্ত্রী সম্পর্কটাকে নিয়ে লেখক কেমনভাবে ভাবতেন তা বোঝাতে এই গল্পের আলোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলাদেশে পুরুষ বিয়ে করতে যায় মানে দাসী আনতে যায়; আর নিজে দেবতা হয়ে পূজো পায়। দু

চারটে যা ব্যতিক্রম তা ব্যতিক্রমই। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন অন্যরকমভাবে। তাঁর প্রিয় ধারণা ছিল কোনো কিছু অর্জন করতে হয় সাধনা করে। এমন কি স্ত্রী কেও। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী বলে তাঁর কাছে গোটা জীবনযাপন আর্টের পর্যায়ে পড়ে। সংসার যাত্রার অর্থ থোড় বড়ি খাড়া করে জীবন কাটানো নয়। রান্নাঘর শাশুড়ির ঘর এবং পরিবার পরিজনের জন্যে উদয়অস্ত পরিশ্রমের মধ্যে আটকে থাকা তাঁর সময়ের মেয়েদের এই আর্টিস্টিক জীবনের স্বাদ বেঁচে থাকার সুখ দিতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের জীবনচর্চার দিকে তাকালে একথার অর্থ বোঝা যায়। চোরাই ধন গল্পে স্ত্রী সুনেত্রা তার ভালবাসার ঐশ্বর্যকে দিনে দিনে ঘরকন্নার ছোট ছোট আয়োজনের মধ্যে প্রকাশ করে চলেছে। --"ভালোবাসার প্রতিভা সুনেত্রার, নব নবোন্মেষশালিনী সেবা . . . ও জানে প্রতিদিন পুজোর নৈবেদ্য সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আহ্নিক অনুষ্ঠান।"[৪৩] মেয়েদের ভালবাসা সেবার কথাই বললেন রবীন্দ্রনাথ। মেয়েদের মধ্যে থেকে এই সুপ্রবৃত্তিকে তো বাদ দেওয়া যাবে না। পুরুষ মনে করে এই ভালবাসা সেবা তাদের প্রাপ্য অধিকার, এজন্য স্ত্রীকে বিশেষ মূল্য দেবার কোনো প্রয়োজন তারা এত দিন অনুভব করে নি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বইল অন্য খাতে। সুনেত্রার স্বামী বলেন,"মহাকাব্যের যুগে স্ত্রীকে পেতে হত পৌরুষের জোরে; যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণী রত্ন। আমি লাভ করেছি কাপুরুষতা দিয়ে . . . । কিন্তু সাধনা করেছি বিবাহের পরে। যাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পেয়েছি তার মূল্য দিয়েছি দিনে দিনে।"[৪৪] পুরুষ সাধনা করছে, মূল্য দিচ্ছে রমণীরত্নকে এ কল্পনা নতুন। আরো আছে, এতদিন জানা ছিল নারী প্রসাধন করে, সৌন্দর্য ধরে রাখতে চায় পুরুষের মন পাবার জন্য। এই গল্পে দেখা যাচ্ছে পুরুষ মানুষও ভাবছে, "এদিকে ডেস্কে-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার যৌবনের ধার আসছে ভোঁতা হয়ে। অন্য কোনো পুরুষ হলে সে কথাটা নিশ্চিন্ত মনে ভুলে গিয়ে পেটের পরিধি বিস্তারকে দুর্বিপাক বলে গণ্য করত না। আমি তা পারি নে। আমি জানি, সুনেত্রা মুগ্ধ হয়েছিল শুধু আমার গুণে নয়, আমার দেহ সৌষ্ঠবে। বিধাতার স্বচরিত যে বরমাল্য অঙ্গে নিয়ে; একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিন্ত তার প্রয়োজন আছে প্রতিদিনের অভ্যর্থনায়।"[৪৫] টুকরো টুকরো এই সব ছবি দেখার পর ভাবতে ভালো লাগে কতভাবে মেয়েদের মনের ইচ্ছেকে সম্মান জানাতে চেয়েছেন; স্ত্রী যে মননহীন অনুভূতিহীন সেবা - মেশিন নয় ভালো লাগা মন্দ লাগা ইচ্ছে অনিচ্ছে সব মিলিয়ে জীবন্ত একটা মানুষ সংসারে তাকেও মূল্য দেবার মত মানুষ আছে এতে মেয়েদের আত্মসম্মান বোধ পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

ল্যাবরেটরি ও বদনাম শেষের এই দুটো গল্প আলোচনা করার আগে জেনে নেওয়া যাক পরিণততর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু কথা।

১. With the advance of old age people become more and more conservative. But with Tagore just the reverse happend. The older he grew the more redical became his views.[৪৬]

২. সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো, যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথাগত, যা দেশে কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র সে সমস্তের ঊর্দ্ধে গেছে তাঁর দৃষ্টি, নীতির চেয়ে সত্যকে বড় করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে।[৪৭]

৩. Contrary to the usual course of development as he (Tagore) grew older he became more radical in his outlook and views.[৪৮]

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মননশীল ব্যক্তিদের এই সব মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কারকামী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ভরবতেন তাঁর সময়ে এই উদার ভাবনা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে নাও হতে পারে। সে কারণে তাঁর মধ্যে শেষ বয়সের লেখা নিয়ে বিশেষত গল্প নিয়ে টেনশন ছিল।

ল্যাবরেটরি গল্প লেখা হয়েছে মৃত্যুর দশ মাস আগে ১৯৪০ - এ। রবীন্দ্রনাথের শেষ বেলাকার কথা নিয়ে লেখা 'নির্বাণ' গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রতিমা দেবী জানিয়েছেন,''ল্যাবরেটরি'' গল্পটি লিখে, পড়তে তাঁর কত সংকোচ। লোকে ঠিক বুঝবে কিনা এই ছিল তাঁর সন্দেহ।''[৪৯]

মীরা দেবীর চিঠিতে আরো খানিকটা বিস্তারিত তথ্য আছে এ বিষয়ে ঃ''বাবা যে গল্পটা (ল্যাবরেটরি) লিখছিলেন সেটা শেষ হয়েছে দু-তিন দিন আগে, . . . সেদিন সকাল থেকে সে কী একসাইট্‌মেন্ট বাবার, . . . বাবা এমন ইরিটেটেড মেজাজে ছিলেন, পড়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যে - ক'টি আমরা উপস্থিত ছিলুম গল্প পড়ার সময় ভয়ে সব জু জু হয়ে বসে, . . .

যে-বিষয় নিয়ে এত ভয় সঞ্চার হয়েছিল আসলে গল্পটা কিন্তু সে-রকম ভয়াবহ নয়। . . . গল্পটা হচ্ছে বর্তমান যুগের মেয়েদের নিয়ে।''[৫০]

রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল,''সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজ্‌মই হোলো সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।''[৫১]

কারো মনে হয়েছে সোহিনীর মত মেয়েরা নারী প্রগতির পরিপন্থী।[৫২] কেউ বা ভেবেছেন বাস্তবে খারাপ মেয়ে হয়েও সোহিনী চরিত্রবতী একটা মহৎ জীবনব্রতে সে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছে।[৫৩] ল্যাবরেটরি গল্পে আছে আধুনিকতার অনেকগুলো পরত। তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সোহিনীকে বোঝার ভুল হতে পারে। সোহিনী নন্দকিশোর দুজনেই প্রচলিত অর্থে ভাল মানুষ নয়। নন্দ কিশোর বিজ্ঞান সাধনায় তার মগজের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পকেটের অক্ষমতাকে মেনে নেয় নি; অসদুপায়ে টাকা উপার্জনে তার কোনো বিবেক তাড়না ছিল না। সেই টাকায় সে গড়ে তুলেছিল তার সাধের ল্যাবরেটরিকে। বহু পুরুষের মন ভুলিয়ে দিনযাপন করতে হত সোহিনীকে। নন্দ কিশোর তার কাছে সেই পুরুষ যে তার মধ্যেকার রত্নকে মূল্য দিতে পারবে। ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দুটি মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ঘর বাঁধল। রবীন্দ্রনাথের গল্পে ব্যবহৃত আধুনিকতা তত উচ্চকিত নয় বলে আমরা খেয়াল করি না সোহিনী আর নন্দ কিশোর সামাজিক বিয়ে না করেই স্বামী স্ত্রীর মতো বসবাস করতে শুরু করে। অনেকটা আজকের দিনের লিভটুগেদারের মতো। এই গল্পের আধুনিকতার এখানেই শেষ নয়। নন্দ কিশোর জানতো সোহিনী অন্যের সন্তান গর্ভে নিয়ে তার ঘরে আসছে। নন্দ কিশোরের মনে স্ত্রী কেমন হবে তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল ঃ 'স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্ম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।' ''[৫৪]

সোহিনী ছোট থেকে ভালমন্দ না বুঝে খোলা মেলা জীবনে অভ্যস্থ -- তার গায়ে দাগ লাগলেও মনে ছাপ লাগে নি। ''নন্দ কিশোর তাকে আবিষ্কার করেছিল -- সে যে স্খলনপ্রবণ দেহ শুধু নয়, শুধু নয় স্বার্থান্বেষী চতুর রমণী -- এ সব নিয়ে এবং ছাড়িয়ে তার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে এক মনস্বিতা, ব্যক্তিত্বের দৃঢ় সত্য, যুক্তি প্রবুদ্ধ পুরুষোচিত স্বাতন্ত্র্য। তাকে জাগিয়ে তুলবার, বাড়িয়ে নেবার দায়ভার বহন করেছিল নন্দ কিশোর। এই তার অহঙ্কার -- এখানে তার মুক্তি।''[৫৫] সোহিনী চরিত্রের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের মধ্যে একটা ক্যারেকটার দেখতে চাইতেন-- পুরুষের কর্মজগতে মেয়েরাও অংশী হতে পারে। শুধু ইমোশন নয়। নন্দকিশোর সোহিনীর মধ্যে ''দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেকটরের তেজ -- বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, ''[৫৬] সোহিনী শরীর সর্বস্ব মেয়ে হলে নন্দ কিশোরের মৃত্যুর পর অজস্র টাকাকড়ি নিয়ে ঐ পথেই ভেসে পড়তে পারতো। বাঙালি বিধবারা যে নিস্তেজ ম্রিয়মাণ জীবন কাটায় সোহিনী সে পথে ও হাঁটেনি ''কাহিনীর কেন্দ্রে যে অতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি তা যেন একটা প্রতীকী সত্য -- সোহিনীর আত্মবলোকন। একে বাঁচানো শুধু স্বামীর স্মৃতিরক্ষা নয়, আপনার মহিমা অভ্রভেদী করে রাখা।''[৫৭] সোহিনী কেমন মেয়ে কোন মূল্যবোধে বিশ্বাসী তার কথাতেই শোনা যাক ঃ ''আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে প'ড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না।''[৫৮] সমাজের কেটে দেওয়া ছকে মেয়েদের মূল্যবোধ নিজেদের জায়গা খুঁজে নিত। রবীন্দ্রনাথ তাদের নিয়ে এলেন নতুন বোধের সামনে। পুরাতন বোধগুলোর সত্যাসত্য যাচায়ের দরকার যুগের প্রয়োজনে। যে শরীরকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এতকাল তা ছাপিয়ে উঠেছে অন্যতর মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা। সোহিনীর মধ্যে দিয়ে সেই পরীক্ষা করলেন ল্যাবরেটরিতে।

শেষের দিকের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল বদনাম। ১৭ মে ১৯৪১ এর সকাল বেলা কবি রানী চন্দকে বললেন, ''প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বলি। . . . তার পরে আমি যখনই সুবিধে পেয়েছি -- বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম ছাড়ব কেন, 'সদু'র মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।''[৫৯]

সৌদামিনী পুলিশ অফিসারের স্ত্রী। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে তার সমর্থন স্বদেশীদের প্রতি। স্বামীকে সে ভালবাসে, স্বদেশীদলের নেতা অনিলকে সে শ্রদ্ধা করে। যদিও গল্পের আগাগোড়া হালকা মজার কথাবার্তায় পরিপূর্ণ কিন্তু তার মধ্যেও ধরা পড়েছে নারীর পরিবর্তিত মানসিকতা। সদুর কাছে ব্যক্তিগত ভালবাসা পতিভক্তির চেয়ে অনেক বড় দেশের জন্য কিছু করা; এই কাজে কলঙ্কের বোঝা নিয়ে গৃহত্যাগের ঝুঁকি নিতেও সে রাজি। অনিল মিত্রকে বাঁচাতে সে বিজয় বাবুকে ভুল খবর দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। স্বামীকে নিয়ে ছোট্ট সংসারে ঠাট্টা তামাসায় মেতে থাকা সৌদামিনীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে প্রতিবাদ মুখর মেয়েটি যার মুখের কথায় রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার প্রতিফলন ঃ ''মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রী বুদ্ধি ষোল-আনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা -- এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা, কুকুরের গলার শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বল-না কেন -- সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না। বুড়িগুলো বলে 'সদু বড়ো লক্ষ্মী' অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সদুর ক্লান্তি নেই। এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে

যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি! আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা - কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে -- হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে।''[৬০]

এই সদুকে কি বোঝা যাবে? মনে হবে না অবাস্তব বানানো? মেয়েরা বেশিরভাগই ঘরকন্নার কাজে আপাত সুখী তৃপ্ত; অত্যাচার অসাম্য আর শোষণে অভ্যস্ত তারা; অশিক্ষা কুশিক্ষা অন্ধসংস্কারে বন্দী বৃহত্তর জীবনের ধারণা থেকে বঞ্চিত সংসারের বাইরে যাদের দৃষ্টি চলে না তাদের পাশে এই মেয়ের জীবন দর্শন তো আলাদা। পুরুষেরাও চায় নি মেয়েরা বেশি কিছু ভাবুক; শাড়ি গয়না পরে গৃহলক্ষ্মী হয়ে পুরুষের মন যুগিয়ে দিন কাটাক তারা। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে নতুন মূল্যবোধে উজ্জীবিত করেন মেয়েদের। রাঁধা বাড়া সতীসাধ্বীগিরি লোকাপবাদ যা যা মেয়েদের পায়ের বেড়ি তা নিয়ে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ করতে তাঁর অস্বস্তি হয় না। সমাজের চোখে অপ্রয়োজনীয় এই দজ্জাল মেয়েকে বাঙালি কন্যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন জীবনের অন্তিম লগ্নে। ভবিষ্যৎ নারীর জীবনাদর্শে রবীন্দ্র সৃষ্ট এইসব নারীরা চেতনার নতুন দিক উন্মোচনে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিকর্মে মেয়েদের সমস্যা মেয়েদের সামাজিক অবস্থান, তাদের শক্তি সাহস সামর্থের কথা সবচেয়ে বেশি আছে ছোটগল্পগুলোতে। একালের আত্মসচেতন মননশীল মেয়েরাও সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ''স্ত্রীজাতির ও যদি সেই স্বপরিচয় না থাকত তাহলে কেবলমাত্র পুরুষতান্ত্রিকতার অত্যাচার সহনের করুণা পাত্র হিসেবে তাদের কোনও অস্তিত্ব এতদিন টিকে থাকত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে উপন্যাসে বিশেষ করে ছোট গল্পে নারীর এই স্বীকায়তাকে, সৃষ্টিতে প্রতিরোধে বিরোধে তার আত্মপ্রতিষ্ঠাকে, বারে বারে তুলে ধরেছেন।''[৬১] আরো একজন আধুনিক সৃষ্টিশীল মেয়ে মনে করেন,''কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের গূঢ় অর্ন্তভেদী দৃষ্টি। রুক্ষ বাস্তবের নির্মম উন্মোচন। . . . ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথকে কবিতা বা গানের রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক আলাদা মনে হয়। মানব চরিত্রের এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাঠক হিসেবে আমাকে সমৃদ্ধ করে।

. . . প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি প্রসঙ্গে আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। . . . ল্যাবরেটরি গল্পের সোহিনীর আশ্চর্য স্বনির্ভর ব্যক্তিত্বের কথা . . . লাবণ্য তো এক আশ্চর্য সৃষ্টি। . . . গল্প উপন্যাসের সাধারণ গৃহবধূ মেয়েরাও কিন্তু বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। সক্রিয় এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারঙ্গম। এরাই হয়ে উঠতে পারত বাঙালি মেয়েদের রোল মডেল।''[৬২] মেয়েদের কথাই শুধু নয় বিদগ্ধ সমালোচক ও ভাবেন ঃ অকল্পনীয় সংবেদনশীলতায় মেয়েদের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে। পীড়িত নারীত্বের এমন মর্মস্পর্শী উদ্‌ঘাটন আর কারো রচনায় পাই না। গভীর একাত্মবোধ যেমন পরিস্ফুট করেছেন নারীর আত্ম জাগরণের স্তরগুলিকে, তেমনি তাদের মর্মান্তিক গোপন বেদনাকে। . . .

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন সমাজে মেয়েদের আত্মজাগরণ ঘটে কিন্তু নানা পীড়নে তাদের আত্ম বিকাশের পথ অবরুদ্ধ, পদে পদে সংকুচিত।[৬৩]

নারীবাদ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে মেয়েদের যুদ্ধ ঘোষণা এইসব আধুনিক তত্ত্বের খুব কাছের মানুষ না হয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে নিবিড়ভাবে ছুঁতে পেরেছিলেন মেয়েদের ক্ষোভ আকাঙক্ষা এবং উত্তরণের জগৎকে।

উল্লেখপঞ্জি

১. সুকুমার সেন/ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-৩ রবীন্দ্রনাথ ১৩৮৮ ইস্টার্ন পাবলিশার্স/ পৃষ্ঠা- ৩২৬
২. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - দেনাপাওনা/ পৃষ্ঠা- ২৬
৩. মালিনী ভট্টাচার্য/ নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস/ দে'জ - ১৯৯৬/পৃষ্ঠা- ৮৮
৪. তদেব /পৃষ্ঠা- ৮৮
৫. তদেব /পৃষ্ঠা- ৮৯
৬. Bimanbehari Majumdar/ Heroines of Tagore/ Firma K.L.M 1968 P-106
৭. রবীন্দ্র রচনাবলী - ৯/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - শাস্তি/ পৃষ্ঠা- ১৪৫
৮. তদেব শাস্তি - ১৪৭
৯. তদেব বিচারক - ১৯৮
১০. তদেব বিচারক - ১৯৮
১১. তদেব বিচারক - ২০১
১২. তদেব দিদি - ২১৬
১৩. Bimanbehari Majumdar/ Heroines of Tagore/ Firma K.L.M 1968 P- 19
১৪. তদেব পৃষ্ঠা- ১৯
১৫. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - প্রতিবেশিনী / পৃষ্ঠা - ৩৩৬
১৬. Bimanbehari Majumdar/ Heroines of Tagore/ Firma K.L.M 1968 P- 307
১৭. তদেব পৃষ্ঠা- ১০৮
১৮. রবীন্দ্র রচনাবলী /৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - হৈমন্তী / পৃষ্ঠা- ৪৮৫
১৯. সুকুমারী ভট্টাচার্য/ সানন্দা ১৪ আগস্ট ১৯৮৬/ বিশেষ প্রবন্ধ 'আমার প্রিয়তম রাবীন্দ্রিক নায়িকা - ৪৮
২০. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় / সানন্দা ১৪ আগস্ট/ বিশেষ প্রবন্ধ 'আমার প্রিয়তম রাবীন্দ্রিক নায়িকা - ৪৮
২১. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - স্ত্রীরপত্র -৪৯৯
২২. তদেব ৫০০
২৩. তদেব ৫০০
২৪. তদেব ৫০৬
২৫. তদেব ৫০৬
২৬. সুকুমারী ভট্টাচার্য/ সানন্দা ১৪ আগস্ট / বিশেষ প্রবন্ধ ''আমার প্রিয়তম রাবীন্দ্রিক নায়িকা/ পৃষ্ঠা- ৪৮
২৭. Bimanbehari Majumdar/ Heroines of Tagore/ Firma K.L.M 1968
২৮. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - স্ত্রীরপত্র -৪৯৯
২৯. তনিকা সরকার/ মৃণাল অন্য ইতিহাসের স্বাক্ষর/ দেশ ৫ আগস্ট - ২০০০ পৃষ্ঠা- ৪০
৩০. নিরুপমা দেবী আমার জীবন সাহিত্য সাধনার স্মৃতি/ এক্ষণ- সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য/ শারদীয় ১৪০১/ পৃষ্ঠা- ১০১

৩১. তনিকা সরকার/ মৃণাল অন্য ইতিহাসের স্বাক্ষর/ দেশ ৫ আগস্ট ২০০০/ পৃষ্ঠা- ৩৫-৩৬
৩২. তদেব পৃষ্ঠা- ৪৪
৩৩. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - অপরিচিতা / পৃষ্ঠা- ৫৩৪
৩৪. তদেব তদেব পৃষ্ঠা- ৫৩৪
৩৫. তদেব তদেব পৃষ্ঠা- ৫৩৪
৩৬. তদেব পয়লা নম্বর /পৃষ্ঠা- ৫৫০
৩৭. তদেব তদেব পৃষ্ঠা- ৫৪৯
৩৮. ক্ষেত্রগুপ্ত/ রবীন্দ্র গল্প অন্য রবীন্দ্রনাথ/ গ্রন্থ নিলয় - ১৯৮৪/ পৃষ্ঠা- ২২৮
৩৯. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - পাত্রপাত্রী / পৃষ্ঠা- ৫৫২
৪০. তদেব তদেব পৃষ্ঠা- ৫৫৫
৪১. তদেব তদেব পৃষ্ঠা- ৫৫৭
৪২. তদেব চিত্রকর পৃষ্ঠা- ৫৭৪
৪৩. তদেব চোরাই ধন পৃষ্ঠা- ৫৭৭
৪৪. তদেব চোরাই ধন পৃষ্ঠা- ৫৭৬
৪৫. তদেব তদেব পৃষ্ঠা- ৫৭৮
৪৬. Bimanbehari Majumdar/ Heroines of Tagore/ Firma K.L.M 1968 P- 121
৪৭. বুদ্ধদেব বসু/ সব পেয়েছির দেশ
৪৮. Jawharlal Neheru/ The Discovery of India
৪৯. প্রতিমা দেবী/নির্বাণ/ বিশ্বভারতী- ১৩৫০/ পৃষ্ঠা- ৩
৫০. তদেব পৃষ্ঠা- ৩-৪
৫১. তদেব পৃষ্ঠা- ২৪
৫২. সুতপা ভট্টাচার্য/ সে নহি নহি/ বিশ্বভারতী- ১৯৯০/ পৃষ্ঠা- ৩০
৫৩. বুদ্ধদেব বসু/ সব পেয়েছির দেশ
৫৪. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ তিন সঙ্গী - ল্যাবরেটরি - পৃষ্ঠা- ৭৬২
৫৫. ক্ষেত্রগুপ্ত/ রবীন্দ্র গল্প অন্য রবীন্দ্রনাথ/ গ্রন্থ নিলয় - ১৯৮৪/ পৃষ্ঠা- ২৯৯
৫৬. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ তিন সঙ্গী - ল্যাবরেটরি - পৃষ্ঠা- ৭৬২
৫৭. ক্ষেত্রগুপ্ত/ রবীন্দ্র গল্প অন্য রবীন্দ্রনাথ/ গ্রন্থ নিলয় - ১৯৮৪/ পৃষ্ঠা- ২৯৯
৫৮. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ তিন সঙ্গী - ল্যাবরেটরি - পৃষ্ঠা- ৭৬৮
৫৯. রাণী চন্দ/ আলাপচারি - রবীন্দ্রনাথ/ বিশ্বভারতী- ১৯৭১/ পৃষ্ঠা- ১০৫-১০৬
৬০. রবীন্দ্র রচনাবলী -৯/ পশ্চিম বঙ্গ সরকার/ গল্পগুচ্ছ - বদনাম - পৃষ্ঠা- ৫৮৬
৬১. জয়া মিত্র/ নারীর মর্যাদার জন্য তাঁর আজীবন লেখার লড়াই/ দেশ ১৫ মে ১৯৯৯
৬২. মল্লিকা সেনগুপ্ত/ রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র থেকে শিখুন/ বর্তমান, রবিবার - ৭ আগস্ট ১৯৯৪
৬৩. অশ্রু কুমার সিকদার/ অবিস্মরণীয় 'বিস্মৃতি রাশি'/ দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৮/ পৃষ্ঠা- ১৩১

উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয় মাত্র বারো। এই সব উপন্যাসে নারী চরিত্ররা কতটা আধুনিক কতটা মুক্তিকামী এই আলোচনা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল চোখের বালি (১৯০৩)। এই উপন্যাসের বিনোদিনী অন্যতম নারী চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ এক সময় য়োকাই-এর Eyes like Sea' র নায়িকা বেসি'-র প্রশংসা করেছিলেন তার প্রাণশক্তির জন্য "চোখের বালির বিনোদিনী ও চতুরঙ্গ -এর দামিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও 'প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান' নারী প্রকৃতি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু হাঙ্গেরির সমাজের সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের গুণগত পার্থক্যের জন্য তাদের পক্ষে 'বেসি' হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।"[১] বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ কৌলিন্য প্রথা সব মিলে মিশে বিধবাদের জীবন যাপন সমাজে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। বৈধব্য এমনই অশুভ অবস্থা যে বিধবাদের বেঁচে থাকবারই দরকার নেই --- এমনই ভাবা হত । রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে চাইলে তাই এত বেশি আলোড়ন উঠেছিল। বৈধব্য দশার জন্য মেয়েরা কোনো ভাবেই দায়ী নয়, অথচ তাদেরই দোষী মানা হত। বাল বিধবাদের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে সব কর্মকান্ড সামাজিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বিধবাদের সমস্যাকে সামাজিক ও মানবিক দুদিক দিয়ে দেখেছিলেন। এ দেশের মানুষদের মানসিকতা তিনি ভালই বুঝতেন। আইন থাকলেও বিধবারা বিবাহের সুযোগ পাবে না একথা জানতেন। তাঁর সৃষ্টিকর্মে এবং ব্যাক্তিগত জীবনাচরণে বিধবাদের নিয়ে তাঁর ভাবনা সুস্পষ্ট একটা পথের ইঙ্গিত দিতে পেরেছিল। লক্ষ করবার বিষয় হল প্রথম থেকেই বিধবা নারী তাঁর রচনার বিষয় হয়েছে। "It is highly interesting to note that this first short story River Stairs (Ghater Katha) is centred round the life of a widow and laborratory, the last but one story published during his life time also deal with the problems of two widows -- Sohini , the mother and Nila, daughter."[২]

প্রথম দিককার গল্পে বিধবারা ছিল অপেক্ষাকৃত কম বয়সী তাদের নিয়ে জটিলতা কম ছিল। 'চোখের বালির'র বিধবা বিনোদিনী পূর্ণ যুবতী । বিধবা বিবাহ নিয়ে প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল বলে বিনোদিনীর বিয়ে দিতে চান নি এমন কথা ঠিক নয় । ১৮৯২ - এ 'ত্যাগ' গল্পে কায়স্থ কন্যা বিধবা কুসুমের সঙ্গে ব্রাহ্মণ হেমন্তের বিয়ে হয়েছে। বিমান বিহারী জানিয়েছেন,"He dose not hesitate to proclaim his sympathy openly for the poor widow, who could not resist the temptatation of accepting the offer of marriage from the person she loved but who had not the courage to devulge to him her true civil status." [৩] 'চোখের বালি' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক বের হবার মাঝে আরো একটি গল্প লেখেন 'প্রতিবেশিনী নামে' সেখানেও বিধবা মেয়েটির বিবাহ হয় তার প্রেমিকের সঙ্গে।

বিধবা বিবাহ হওয়া না হওয়ায় সমস্যা বিনোদিনীর নয়। "লোভ ও পবিত্রতা, রমণীয়তা ও নির্দয়তার অপূর্ব সমাহারে তৈরি বিনোদিনীর বাংলা সাহিত্যে অনন্যা অবশ্যই। যুবতী, সুন্দরী, কাব্য সাহিত্যে অনুরাগিণী এই বিধবা মেয়েটির তীব্র মনের ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ক্ষুধাও আড়াল থাকে নি। জীবন তাকে বঞ্চনা করেছে বলে এক এক সময় সে প্রতিশোধের জন্য লক লক করে ওঠে, আবার

তার অন্তরের বিশুদ্ধতা কোনো কিছুতেই ধ্বংস করতে দেয় না,"[৪] প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ বিনোদিনীর কাশীবাস অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের মনে হয়েছে লেখক বিধবাকে বিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি বিনোদিনীর আগেই বিধবা বিবাহ দেওয়া হয়েছে । সুতরাং ঔপন্যাসিকের দ্বিধার প্রশ্নটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা দেখা প্রয়োজন । আসলে প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ যুক্তিক্রম থাকে সেটাই ঠিক করে দেয় চরিত্রটির পরিণতি কি হবে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনোদিনীর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "বিনোদিনী আজীবন ব্যবহৃত হয়েছে। . . . আজন্ম বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহরের সঙ্গে স্বার্থের চেহারা সে মিশিয়ে ফেলেছে। কাজেই নিজের পরম স্বপ্নকে সে আর, ব্যবহার করতে চাইল না।"[৫] বিহারী বিনোদিনীকে বিয়ে করতে চাইলে এ বিষয়ে বিনোদিনীর বক্তব্য ছিল, "আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে --- আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।"[৬] তার চরিত্রের তেজস্বিতা বিশুদ্ধতা পড়াশুনা সব মিলিয়ে এক স্বতন্ত্র বোধে সে জানত তার ও কিছু গৌরব আছে -- বিহারীর কাছে সে শ্রদ্ধা মিশ্রিত যে ভালোবাসা পেয়েছিল দৈনন্দিন সংসারের তুচ্ছতায় তাকে হারিয়ে যেতে দিতে রাজি ছিল না । তার বঞ্চনাময় জীবনে এই মর্যাদাপূর্ণ ভালোবাসা নারী হিসেবে তাকে মূল্য দিয়েছিল । কাশীবাসী হবার কোনো ইচ্ছাও তার ছিল না। সে চেয়েছিল সমাজের সেবায় কাজে নিজেকে যুক্ত করতে তাই বিহারীকে প্রস্তাব দিয়েছিল, "শুনিলাম গরীবদের চিকিৎসার জন্য গঙ্গার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ -- আমি সেখানে তোমার কোনো একটা কাজ করিব। কিছু না হয় তো আমি রাঁধিতে পারি ।" [৭] কৃষ্ণ কৃপালিনী বিনোদিনী সম্পর্কে বলেছেন, "of all the women characters created by Tagore in his many novels, Binodini is the most convincing , vital and full blooded." [৮] বিনোদিনীর আধুনিকতার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে M. Sarada-র বক্তব্যে "It may be said that Binodini heralds the emergence of a new class of emancipated Indian women , who are no longer prepared to be downtrodden by society but fight to assert their rights." [৯]

১৯১০ - এ লেখা হয়েছে দীর্ঘ উপন্যাস 'গোরা' । এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি আলোচনার আগে কাহিনীর চালচিত্রটিকে জেনে নেওয়া দরকার । ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিংশ শতাব্দীর শুরুর সন্ধিক্ষণে একটি জাতির বিদগ্ধ সমাজের স্বাদেশিকতাবোধ, নব্য হিন্দুত্ববাদ, ব্রাহ্ম ধর্ম এবং মানবতাবাদের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে এই উপন্যাস । কোনো একটিমাত্র মতের মধ্যে তিনি সমগ্র জীবন-সত্য তথা আত্মিক ভারতবর্ষের অখন্ড আভাষ দেখেন নি। নানা চরিত্রের মধ্যে আপনাকেই যেন লেখক নানা খানা করে দেখেছেন ।[১০] 'চোখের বালি' ও নৌকাডুবি' তে নারী চরিত্ররা পারিবারিক এবং ব্যাক্তিগত সম্পর্কের গন্ডীর মধ্যে চলাফেরা করেছে। গোরা উপন্যাসের নারীচরিত্ররা সামাজিক ধর্মীয় রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি প্রশ্নের আবর্তে বিচরণ করছে । স্বভাবতই তাদের বৌদ্ধিক ও চারিত্রিক গঠন অনেক পরিমাণে ঋজু ও উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা শাণিত বুদ্ধিতে স্বভাবের দৃঢ়তায় অন্তর বাইরের সৌন্দর্যে বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গোরার নারী চরিত্রে এসব গুণ পূর্ণভাবে বিকশিত। গোরা উপন্যাসে নারী চরিত্রের দু ধরনের বিন্যাস দেখা যায় । একদিকে আনন্দময়ী সুচরিতা ললিতা, এরা সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে জীবনকে দেখতে চেয়েছে নিজেদের বোধবুদ্ধি মত। তার জন্য প্রতিকুল অবস্থায় অবিচলিত থেকে প্রতিবাদ করেছে, উপেক্ষা করে বিরোধীপক্ষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে পেরেছে। অপরদিকে আছে বরদা সুন্দরী হরিমোহনী লাবণ্য এরা সকলেই নারীর সীমাবদ্ধ মানসিকতার প্রতিরূপ। বরদাসুন্দরী আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মমহিলা হলেও মানসিকতায় সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী। হরিমোহিনী একেবারেই প্রাচীনপন্থী মেয়েদের

কোনো ধরনের স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। এমন কি নিজের মেয়ের দুঃখজনক পরিণতিও তাঁকে কোনো শিক্ষা দেয় না । তিনি অশিক্ষিত শুধু নন কুশিক্ষা তাঁর মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে আছে । পরেশবাবুর বড়মেয়ে লাবণ্য মায়ের ছায়া মাত্র তার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই।

আনন্দময়ী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সৃষ্টি। তাঁর মতবাদ এবং মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে এই চরিত্রে ; "Anandamoyi is unique and the nobelest creationin the galaxy of Tagore's women characters. In her non-Sectarian and liberal outlook, pervasive love and Sympathetic under standing, Anandamayi is 'nearer to Tagore's vision of life,' than any other character. No other character is endowed with the same culture, enlightened mind and advanced views of life and marriage." [১১]

বিভিন্ন লেখায় লেখকের মতাদর্শের বাহন হয়ে ওঠে কোনো কোনো চরিত্র। ঘরে বাইরের নিখিলেশ, গোরার পরেশবাবু , চতুরঙ্গের শ্রীবিলাস এই ধরনের পুরুষ চরিত্র, এর পাশেই যে নারী চরিত্রটির কথা বলা যায় তিনি আনন্দময়ী। আনন্দময়ীর যুক্তিবোধ, প্রচলিত আচার সর্বস্বতার বিরোধিতা জয়কালীর (অনধিকার প্রবেশ)মধ্যেও দেখা গেছে, কিন্তু আনন্দময়ী উপন্যাসের বিস্তারিত পটভূমিকায় আরো স্পষ্ট আরো পরিপূর্ণ। বয়স্ক মহিলারা জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি পূজো আচ্চা নিয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করত । ব্রাহ্মণ হলে তো কথাই নেই। অথচ আনন্দময়ী কত সহজে বলতে পারেন; "তা হই না বামুনের মেয়ে । বামনাই করা তো আমি ছেড়েই দিয়েছি । . . . পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাকে খৃস্টান বলে, আরো কত কী কথা কয় -- আমি সমস্ত মেনে নিয়েই বলি, তা খৃষ্টান কি মানুষ নয়। তোমরাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানের এত আদরের তবে তিনি একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার খৃষ্টানের পায়ে এমন করে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?"[১২] তাঁর যুক্তির শাণিত খোঁচা অনুদার মানসিকতাকে বিদ্ধ না করে ছাড়ে না। অন্ধ স্নেহের বন্ধনে যে মা সন্তানকে পদে পদে বেঁধে রাখে বাংলাদেশে সেই মূঢ় মাতৃত্বকে রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি। "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী,/রেখেছ বাঙালি করে -- মানুষ কর নি।"[১৩] কবির এই খেদোক্তি শুধু অ্যাবস্ট্রটি দেশ মাতৃকার প্রতি নয়, বাঙালি ঘরের অতি স্নেহকাতর মায়েরাই এর প্রধান লক্ষ্য। মূঢ়তা কুসংস্কার অশিক্ষা এবং কুশিক্ষা মেয়েদের এইসব ত্রুটি তার কাছে অসহ্য ছিল। বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর নায়িকারা শারীরিক সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। আনন্দময়ীর স্বভাবের পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন ঃ "নিজের কষ্ট হইবে বলিয়া অথবা কল্পনায় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া আনন্দময়ী কখনো কাহাকেও নিষেধ করিতেন না। নিজের জীবনে তিনি অনেক বাধা বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের পৃথিবী তাঁহার কাছে অপরিচিত নহে; তাঁহার মনে ভয় বলিয়া কিছু ছিল না।"[১৪] মেয়েরা সামাজিক নিপীড়নের অন্যতম শিকার বলে তাদের কথায় আচরণে ধর্মীয় সংকীর্ণতা, সামাজিক পীড়ন, অন্যায় অযুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা, বিশেষ তাৎপর্য পায়। এই ধরনের সমালোচনা 'রবীন্দ্র সাহিত্যে মেয়েদের মুখ থেকেই আসে সবচেয়ে জোরদার রূপে'।[১৫] মেয়েদের মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তি মাতৃত্বের ওপর রবীন্দ্রনাথ অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন; আনন্দময়ী মাতৃত্বকে সেই অন্ধ প্রাকৃতিকতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নিজের অপরিসীম ভালোবাসার ক্ষমতা এবং সূক্ষ্ম যুক্তিবোধ ছাড়া কোন সংস্কারের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেন নি তিনি।

বরদাসুন্দরী ও হরিমোহিনী নারীর আরো এক চেহারা যাদের প্রতিনিয়ত দেখে থাকি সংসারের গন্ডীর মধ্যে। বরদাসুন্দরীর চরিত্র বরাবরই একরকম বৈচিত্র্যহীন। ব্রাহ্ম সমাজের অতি প্রগতিশীল

মহিলার ভূমিকা পালন করতে গিয়ে নিজেকে হাস্যকর অবস্থায় নিয়ে গেছেন। হরিমোহিনী নিজে শ্বশুর বাড়িতে অকথ্য অত্যাচার অপমান সহ্য করেছেন, তাঁর মেয়ে মনোরমার কপালেও জুটেছে স্বামীর দুর্ব্যবহার নির্যাতন, মেয়ে প্রতিরোধ করতে চাইলেও হরিমোহিনীর জন্য সফল হয় নি। জোর করে স্বামীর ঘর করতে পাঠালে গর্ভিণী মনোরমার সেই রাতেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ব্যক্তিগত দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকেও তিনি কিছু শেখেন নি। সুচরিতার ভাল মানুষীর সুযোগে তাঁর হাতে ক্ষমতা এলেই তিনি সুচরিতার উপর অনাবশ্যক কর্তৃত্ব দেখাতে গেছেন। তাঁর ভিতরকার কুশিক্ষিত সাংসারিক দ্বন্দ্বের সংকীর্ণতার অভ্যস্থ বাঙালি মেয়ের আদলটি বেড়িয়ে পড়েছে। মাতৃসমা এই দুই নারীর পাশে রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের মূর্তিমতী প্রতিমা আনন্দময়ী একেবারেই ভিন্ন জাতের। রবীন্দ্রনাথ কেমন মা দেখতে চান আনন্দময়ী তারই উদাহরণ।

গোরা উপন্যাসের আরো একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল ললিতা। এই কম বয়সী মেয়েটি স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত তারুণ্য জেদ বুদ্ধির স্বচ্ছতা সততা আর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বিনয়ের মনই কেবল হরণ করে না পাঠকের মনেও ছাপ ফেলে। সে তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। তার জীবন সংকটের মুহূর্তে স্বাধীনভাবে জীবন কাটানোর চিন্তায় মেয়েদের লেখাপড়ার স্কুল খুলে স্বনির্ভর হবার কথা ভাবে। তার ক্ষুদ্র জীবনের প্রতিটি ঘটনায় তার প্রতিক্রিয়া, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা পারিপার্শ্ব পরিস্থিতিকে বিচার করে গ্রহণ করার দক্ষতায় প্রায় মনেই থাকে না সে একটা কিশোরী মাত্র। তার মত মেয়েদের বিষয়ে সমালোচকের মত হল ঃ Women like Lolita are ready to come out of the portals of tradition and orthodoxy and will not allow themseleves to be oppressed by the male - dominated society. Besides asserting their equality with men, they are eager to serve the people and take an active part in the progress of the country.[১৬] ললিতা য়ুরোপের লোকহিতৈষী রমণীদের জীবন চরিত পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের হেড মাষ্টার পানুবাবু তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছায় লাগাম পরাতে চাইলে তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছে। সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়েও অতটুকু মেয়ে ভেবেছে। বিনয়ের সঙ্গে তর্ক করে সে বলেছে, "আপনারা মনে করেন, জগতের কাজ আপনারা করবেন, আর আপনাদের কাজ আমরা করব। সেটি হবার জো নেই। জগতের কাজ হয় আমরাও চালাব, নয় আমরা বোঝা হয়ে থাকব; আমরা যদি বোঝা হই -- তখন রাগ করে বলবেন; পথে নারী বিবর্জিতা। কিন্তু নারীকেও যদি চলতে দেন, তা হলে পথেই হোক আর ঘরেই হোক নারীকে বিবর্জন করার দরকার হয় না।"[১৭] নারীর সপক্ষে কথা বলার জন্য এমন জেদী আর জোরালো চরিত্রদের সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সুচরিতার দ্বিধাহীন অসংকোচ উপস্থিতি প্রথম দর্শনেই মনকে আকৃষ্ট করে। তার মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী রবীন্দ্র সাহিত্যেও বেশি দেখা যায় না। তার সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মন, সমালোচনামূলক বিচারবোধ, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি, সৌন্দর্য সচেতনতা কোমল মাধুর্যের সঙ্গে স্বভাবের দৃঢ়তা মিলে তাকে অন্য মেয়েদের তুলনায় পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে। মেয়েদের কুসংস্কার নিয়ে গোরা সমালোচনা করেছে শুনে সুচরিতার বক্তব্য হল,"আপনারা মনে করেন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে মেয়েদের রাঁধতে - বাড়তে আর ঘর নিকোতে দিলেই তাদের সমস্ত কর্তব্য হয়ে গেল। একদিকে এমনি করে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি সমস্ত খাটো করে রেখে দেবেন, তার পরে যখন তারা ভূতের ওঝা ডাকে তখনো আপনারা রাগ করতে ছাড়বেন না। যাদের পক্ষে দুটি - একটি পরিবারের মধ্যেই বিশ্বজগৎ তারা কখনোই সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না -- এবং তারা মানুষ না হলেই পুরুষের সমস্ত বড়ো কাজকে নষ্ট করে অসম্পূর্ণ করে পুরুষকে

তারা নীচের দিকে ভারক্রান্ত করে নিজেদের দুর্গতির শোধ তুলবেই।''[১৮] সুচরিতার বলার ধরনেই বোঝা যায় তার মানসিক জগৎ কত পরিণত। মেয়েদের ত্রুটিগুলোর জন্য শুধু সমালোচনা করলে হবে না, আগে সুযোগ দিতে হবে তারপর সমালোচনা -- সুচরিতার কথায় আধুনিক মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতবর্ষের সত্তার সঙ্গে সুচরিতার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে গোরা। সুচরিতার নিজের প্রস্তুতি এবং আগ্রহ না থাকলে জাতীয় জীবনের জটিল ও বিপুল ইতিহাসকে সে বুঝতে পারত না। ধর্মবোধ স্বদেশিয়ানা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনায় সাবলীলভাবে অংশ গ্রহণ করেছে সে, নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে। গোরা আবিষ্কার করেছে বুদ্ধি ও ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ সুচরিতার গভীর হৃদয় কে। মেয়েদের মধ্যে শুধু শারীরিক সৌন্দর্য নয়; নয় শুধু গৃহকর্মের নিপুণতা তাদের বুদ্ধির সৌন্দর্য ও আবিষ্কার করেছে রবীন্দ্রনাথের নায়কেরা। রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের আরো একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তারা বাঙালি মেয়ের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিল না। নিজের প্রতি হোক বা অন্যের প্রতি হোক যে কোনো রকমের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তারা ছাড়েনি। গোরায় ললিতা সুচরিতা এই ভূমিকা পালন করেছে।

সুচরিতার ধারণা,''ঘরকরনার মধ্যে ছাড়া মেয়েদের আর কোথাও দেখলে তিনি বোধ হয় শ্রদ্ধা করতে পারেন না'' [১৯] গোরার এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে ভারত আত্মার সন্ধানে সে সুচরিতার হাত ধরেই যেতে চেয়েছে। গোঁড়া হিন্দু থেকে মানবতাবাদী হয়ে ওঠা গোরা চরিত্রে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিস্তার করেছে দুজন নারী আনন্দময়ী ও সুচরিতা। গোরার জাতহীনতা, ভারতবর্ষের বিশালত্বের চেতনা, গোঁড়ামিকে পরিত্যাগ করে নতুন মানবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ এই নতুন জীবনের সঙ্গে নতুন যুগের সংস্কার মুক্ত স্বচ্ছ চেতনা সম্পন্ন যে মেয়ে সঙ্গী হতে পারল সে সুচরিতা। আধুনিক নারী পুরুষের জুটি এরা।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত ঘরে বাইবে (১৯১৬) উপন্যাসের নায়িকা বিমলাকে ঘরের বাইরে এনে নারী চরিত্রের এক পরীক্ষা করলেন রবীন্দানাথ। বিষয় যেমনই হোক আধুনিককালের নারী পুরুষের ভিতরকার সম্পর্কের টানা পোড়েন কে ভিন্ন পরিস্থিতিতে আরো একবার বুঝে নিতে চান ঔপন্যাসিক । মেয়ে মানুষের মন সবই এক ছাঁচে ঢালা বিমলা একথা বিশ্বাস করে না । সে লেখাপড়া শিখেছে স্কুল কলেজে গিয়ে নয়, তার স্বামীর ব্যবস্থাপনায় বাড়িতে মেম রেখে। স্বামীর প্রতি ছিল তাঁর অচলা ভক্তি। স্বামী নিখিলেশ সম্পূর্ণ একালের মানুষ স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী । নিখিলেশ বিমলাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয় দিতে চায় । অন্ধ ভক্তির অর্ঘ্য নয় অন্যের সঙ্গে যাচাই করে আপনার প্রেমের মূল্য পেতে চাইল । বিমলা স্বামীর কাছ থেকে অপর্যাপ্ত পেয়েছিল । কিন্তু সে ভাবে প্রস্তুত ছিল না সে ।''. . . আমি যে অমনি পেয়েছি ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না। দাম দিতে হয় ।''[২০] স্বামীর দৌলতে বিমলার মুক্তি।

ঘরে বাইরের বিমলার আগে অনেক প্রতিবাদী প্রগতিশীল নারীচরিত্রর দেখা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের লেখায়। বিমলা সেই সব শ্রেণীর নারীর প্রতিনিধিত্ব করে না। তাঁর মধ্যে আমরা পাই এক পরাজিত নারীকে বাইরের জগতে প্রবেশাধিকার কার পেয়েও যে আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার বাইরে পা রাখতে পারল না । নিখিলেশের মতো একালের মানুষের উদার সহযোগিতা তার জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেল। জীবনে চরম দুঃখের বিনিময়ে বিমলাকে 'সিঁথির সিদুরের মূল্য' বুঝতে হল।

মেয়েদের নিয়ে লেখা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'নারী' (১৯৩৬) তে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন যোগ্যতা লাভকে ঃ ''ফললাভের কথা পরে আসবে -- এমন কি না আসতেও পারে--কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্বাগ্রে ।''[২১] দেখতে হবে বিমলাকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল তার জন্য কতটা যোগ্যতা সে অর্জন করেছিল।

ততদিনে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার হয়েছে, বাইরে বেরোবার স্বাধীনতা কিছুটা পেয়েছে মেয়েরা পরিবারে শিক্ষিত পুরুষেরাও এগিয়ে এসেছে মেয়েদের সাহায্য করতে । মেয়েদের জীবনের এলাকায় ঢুকে পড়েছে অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতা । মেয়েরা নিজেরা কতটা প্রস্তুত করতে পেরেছে নিজেকে তারও একটা পীক্ষার বোধহয় প্রয়োজন ছিল । বিমলাকে দিয়ে নিখিলেশ তেমনই এক পরীক্ষা করতে গিয়েছিল, ''বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে- সে ছিল ঘর গড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতক গুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। . . . স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত বিমল কে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল। . . . ভেবেছিলুম বড়ো জায়গায় এসে জীবন কে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাত্মের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন করে জিভের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়।''[২২] বিমলের চরিত্রের মধ্যেই ছিল প্রস্তুতির অভাব। সন্দীপ যখন বিমলের জীবনে এসে পড়ল সঙ্গে নিয়ে এল স্বাদেশিকতার প্রবল উত্তাপ। বিমলাকে স্তুতি করে করে দেবী বানিয়ে তুলল। বিমলার ভুমিকা অনুপ্রেরণা দাত্রী মক্ষীরাণীর। মহিমান্বিত নারী রূপের ধারণা থেকে বিমলা সাজে সজ্জায় কর্মে জীবনে নিজেকে অসামান্যতার পর্যায়ে নিয়ে গেল।

বিমলের আন্তঃ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে নিখিলেশ জানিয়েছে, ''আসলে বিমল স্বভাবত যাকে বলে মহিলা। . . . যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেছে, যাতে করে ছোটো ভাগের হীনতার গন্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলীন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব স্থান পায়, বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল । . . . বিমল কে আমার সাধনার মধ্যে পাই নি।''[২৩]

বন্দেমাতরম, ধ্বনিতে বিমলার যে জাগরণ তা তার স্বদেশ ভাবনাকে সমৃদ্ধ করে না, উল্টে আত্ম মগ্নতার এক অভূতপূর্ব পরিবেশে সে জেগে উঠে বলে, ''আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে; একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। . . . এ আজ অভিসারিকা । . . . এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ; সেই আবেগে সে চলেছে মাত্র, . . . আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা । আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি । উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে,''[২৪] এই অস্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে সন্দীপের স্তুতিকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিল সে - ''আমি ভুলে গিয়েছিলুম আমি বিমলা ।''[২৫] নিজের মহিমার নেশায় মাতাল হয়ে নিজেকে শক্তিরূপিনী কল্পনা করে বরদান করতে চেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় থিয়োরি ছিল পুরুষের মধ্যে আছে শক্তি নারীর মধ্যে আছে প্রাণ । কিন্তু সন্দীপের মুখে সে কথা বসিয়ে নিজের থিয়োরির বিরোধিতা করলেন । সন্দীপ বলেছিল ''আমরা পুরুষরা বড়ো জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয় । ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয়, পালন কবে, বাহির থেকে নয়। এ দানই তো সত্য দান ।''[২৬] বাক্যবাগীশ সন্দীপ এখানে কথায় ভুলিয়ে সার্থসিদ্ধি করতে চায় । থিয়োরি হিসেবে একাথার আর কোনো মূল্য নেই তার কাছে।

নিখিলেশের মাস্টার মশায়ের মনে হয়েছিল বিমলাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে বড়ো জায়গা থেকে সব সব ব্যপারটাকে দেখলে বুঝতে পারবে । জীবনে একটি মাত্র বাইরের পুরুষকে দেখে তার মুখের বাণী শুনে এত অভিভূত হবার কারণ ছোট জায়গা থেকে বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখা । বিমলার চারপাশকে আরো বিস্তৃত উন্মুক্ত করা দরকার, 'মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে বড় জায়গা থেকে দেখা প্রয়োজন । ঘরের সঙ্গে বাইরের তাল মেলাতে না পেরে আত্মগ্লানিতে বিমলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে নিখিলেশ তারও কারণ খুঁজেছে নিজের আচরণের মধ্যে। ''আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে । কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয় ।''[২৭] নিজের আইডিয়াকে বড় করে দেখার জন্যে নিখিলেশ বিমলাকে নিয়ে পরীক্ষায় মেতে ছিল । কিন্তু পরিণতি বা লক্ষ্য বিষয়ে বিমলার নির্মাণ কর্তা নিখিলেশেরও ধারনা ছিল না ।

মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি থাকে - এক বুদ্ধিতে বিমলা সন্দীপের কথার মোহে আচ্ছন্ন হলেও তার আর এক বুদ্ধি মরে যায় নি। বড় বেদনার মধ্যে দিয়ে তার নিজের অপূর্ণতা ও যোগ্যতার অভাবকে মেনে নিয়েছিল । কোনো রাজনৈতিক জাগরণ তো তার পক্ষে সম্ভব নয়, অত বড়ো করে তো দেশের ঐতিহাসিক পরিতস্থিতিকে সে ধরতে পারে নি । দেশ বলতে কল্পনায় ছিল নিজের মতো লক্ষ্যবিহীন ঘর ছাড়া মেয়ে । জেগে উঠে বিমলা একালের উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন স্বামী নিখিলেশের ভালবাসায় ফিরে যেতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক । তার রাজনৈতিক জাগরণ হল না ঠিকই কিন্তু জীবনের বৃহৎ পটভূমিতে নিজের সীমাবদ্ধতাকে অনুভব করতে শিখল ।

১৯১৬-য় লেখা হয় চতুরঙ্গ উপন্যাস। পুরুষ ব্যবহৃত মেয়ে সমাজে নিন্দিত ও তিরস্কৃত হয়। পুরুষের শত অন্যায় গণনার মধ্যে ধরা হয় না, অসহায় মেয়ের সর্বনাশ করেও তারা পার পেয়ে যায়। কিন্তু এই সব মেয়েরা কখনো ক্ষমা পায় না, সমাজের চোখে তারা চিরজীবনের মতো পতিত হয়ে যায়। চতুরঙ্গ উপন্যাসে দেখি ভিন্ন চিত্র। জ্যাঠামশায় জগমোহন এবং শচীশ ধর্ম মানে না জাতপাত মানে না, মানুষকে মানে। বাপ মা মরা মেয়ে ননীবালা নিজেকে রক্ষা করতে অসমর্থ। শচীশের বড়দা পুরন্দরের কৃপায় কিশোরী কন্যাটি অকালে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন জগমোহন তাঁকে সাহায্য করেছে শচীশ। নিতান্ত কচি মুখে জগমোহন কোনো পাপের কালিমা খুঁজে পান নি। মেয়েদের জন্য রবীন্দ্রনাথের মমতার পরিচয় আগেও পাওয়া গিয়েছে আবারও পাওয়া গেল ননীবালার মত ছোট্ট একটা চরিত্রের পরিকল্পনায়। এই পতিতা মেয়ের হাতে না খেলে জগমোহনের তৃপ্তি হত না। ননীবালার সামাজিক সম্মান বাঁচানোর জন্য জ্যাঠামশায়ের উপযুক্ত ভাইপো শচীশ তাকে বিয়ে করতে

চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ননীবালা নারীর সংস্কার জয় করে বিয়ে করতে পারে নি, আত্মহত্যা করেছে। ননীবালার বাঁচা মরার থেকেও বড় কথা হল ননীবালার জ্বলন্ত সমস্যাকে সমাজ রক্ষকদের সামনে তুলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথ।

চতুরঙ্গ উপন্যাসের মূল আকর্ষণ দামিনী। দামিনীর উপস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন। "উপন্যাসের মূল ঘটনায় দামিনীর বিদ্রোহ আসল কথা। দামিনীই প্রমাণ করল যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক অর্থনৈতিক কাঠামো-ই শুধু পুরুষ প্রাধান্যসূচক, বা পুরুষাধিপত্যে চালিত নয়, আধ্যাত্মিক মুমুক্ষাও সেখানে পুরুষাধিপত্যের বশম্বদ। ননীবালার ও নবীনের স্ত্রীর ভিন্নার্থক আত্মহত্যা থেকে মনে হয় লেখক এ সময়ে নারীর ব্যক্তি মর্যাদার অবদমন বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। দামিনী কল্পনা তারই ফল।"[২৮] সে ঐতিহ্যানুসারী মহিলা নয় অন্ধভাবে কিছু সে মানতে পারে না; না স্বামী না ধর্ম না গুরু।

দামিনীর জীবনের ইতিহাসটুকু জানা না থাকলে তার চরিত্রের অনমনীয় প্রতিবাদকে বোঝা যাবে না। শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিয়েতে দামিনীর বাবা মেয়েকে যথেষ্ট গহনা এবং জামাইকে আহার সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জামাই এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছে শ্বশুরের দুঃসময়ে বাড়িতে গুরু ভক্ত জুটিয়ে মহোৎসব করে এবং শ্বশুরকে এক পয়সাও সাহায্য না পাঠিয়ে। দামিনীকে বাধ্য করা হয়েছে বাড়িতে পঞ্চাশ - ষাট মনের খাবার ব্যবস্থা করতে। সেই থেকে দামিনীর প্রতিবাদ শুরু। লীলানন্দ স্বামী ও তার শিষ্যদের খাবার দাবার পুড়িয়ে সে ক্রোধ প্রকাশ করেছে। ধর্মের নামে এই মানসিক হীনতা তাকে করে তুলেছে ধর্মের প্রতি বিমুখ, লীলানন্দ গুরুর প্রতি বিতৃষ্ণারও সূত্রপাত এখানে। শিবতোষের জীবনে দামিনীর ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর; এই নারীকে বোঝবার মত কোনো বোধ বুদ্ধিই তার ছিল না। বরং মৃত্যুর সময়ে ভক্তিহীন নারীকে সারা জীবনের জন্য শাস্তি দিতে সমস্ত সম্পত্তি সমেত গুরুর হাতে দিয়ে গেল। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যেমন তার মৃত্যুর পরেও তেমনি দামিনীর নিজের জীবন এবং পিতৃদত্ত সম্পত্তিতে নিজের কোনো অধিকার রইল না। কিন্তু দামিনী নিজের জীবন স্বাধীনভাবে চালাতে চাইল। এখান থেকেই বিরোধের শুরু। লীলানন্দ স্বামী এবং তার শিষ্যদের ঘিরে দামিনীর বিচরণের জগৎ সীমাবদ্ধ। এই ক্ষুদ্র জগৎ তার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

দামিনীর প্রথম পরিবর্তন এল লীলানন্দ স্বামীর প্রধান শিষ্য শচীশকে দেখার পর। তার জীবন তৃষ্ণা জেগে উঠে মুক্তি পেতে চাইল। শিবতোষ কোনদিনই দামিনীর মনে ঠাঁই পায় নি .সে যোগ্যতা তার ছিলও না। দামিনীর ভালোবাসা আধার না পেয়ে উন্মুখ হয়েছিল। তাই-ই শচীশের প্রতি তীব্র আকর্ষণের অন্যতম হেতু। শচীশের অসামান্যতা তাকে আকৃষ্ট করেছিল।

শচীশ এবং শ্রীবিলাস দুজনেই দামিনীকে দেখেছে গুরু গৃহে। শ্রীবিলাসের মনে হল ঃ"দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী; বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে ঃ

. . . দামিনীর মধ্যে নারীর আর- এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে;

সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্নাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।''[২৯]

স্ত্রীর পত্রের মৃণালের কাছে বাঙালি মেয়ের পক্ষে মরাটা সহজ বলেই মনে হয়েছিল, তাই সহজ কাজটা না করে বেঁচে থাকার মত কঠিন কাজটা বেছে নিয়েছিল সে। দামিনী আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল সে শুধু বাঁচতেই চায় না জীবনের রস শুষে নিয়ে পরিপূর্ণ আনন্দে খুশিতে ভরে উঠতে চায়। আর জীবনকে নতুনভাবে চায় বলেই শচীশের মতো অসামান্য পুরুষে মুগ্ধ হয়। দামিনী বিধবা তার দ্বিতীয় বিবাহ সামাজিক বিরোধিতার মুখে পড়বে কি না, লীলানন্দ গুরুর কাছ থেকে কি করে মুক্তি মিলবে, এমন কি সে যাকে ভালবাসে তাকেও জীবনের মাঝে পাবে কি না এসব কোনো ভাবনাই তাকে জীবন তৃষ্ণা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

শচীশের মন আইডিয়ার জগতে বিচরণ করে; অস্তিনাস্তির টানাপোড়েনে সে নিজের মধ্যে কোনো স্বস্তি খুঁজে পায় না। দামিনীকে সে প্রথমাবধি উপেক্ষা করতে চেয়েছে। নারীকে ভেবেছে প্রকৃতির চর। কিন্তু দামিনীকে সে উপেক্ষা করতে পারে নি, দামিনীর উপস্থিতিতে স্বীকার করে নিয়েছে। শচীশ নিজের কাছে সে কথা অস্বীকার করতে চায় সাধনার ব্যাঘাত হবে বলে।

দামিনীর তেজ প্রকাশ পেয়েছে নিজের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতায়। শচীশের আশ্রম জীবনকে সে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে দামিনীকে শচীশ অন্যত্র সরিয়ে দিতে হয়েছে। দামিনী সেই ব্যবস্থায় বিরুদ্ধাচারণ করে বলেছে,''তোমাদের কোনো ভক্ত বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত বা আর-এক মতলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন -- মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ - পঁচিশের ঘুঁটি?

. . . দামিনী কহিল, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।''[৩০]

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের দামিনী। সে তথাকথিত শিক্ষিত নয়; পিতৃকুল স্বামীকুলের অসামান্য শিক্ষাদীক্ষায় গড়ে উঠবার সুযোগ পায় নি; পরেশবাবুর মতো স্থিতধী মননশীল মানুষের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তার হয় নি; বিমলার মতো আধুনিক সংবেদনশীল প্রেমিক স্বামী পায় নি। তার জীবনটা নদীর চরের মতো ধূ ধূ বালুচরে হারিয়ে যেতে পারত। সে তা হতে দিতে চায় নি বলেই তাকে এত কষ্ট পেতে হয়েছে। মেয়েরা প্রকৃতির চর এই ধারণা থেকে সরে এসে শচীশ দামিনীর কাছে মাপ চেয়েছে ঃ ''আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এতো বড়ো অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না। . . . আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।''[৩১]

দামিনী একভাবে যা চেয়েছিল আর একভাবে তা পেল। নারীকে এই অপমানের বোঝা বইতে হয়েছে সে প্রকৃতির চর পুরুষের সাধনায় বিঘ্ন স্বরূপ, আর কোনো অস্তিত্ব যেন নেই তার। সেই জায়গায় থেকে সরে এসে শচীশ নারীকে দূরে রেখে নয় সঙ্গে নিয়ে সাধনায় ব্রতী হতে চেয়েছে।

দামিনী যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে শুদ্ধাচারে জীবন কাটাতো তা হলে তার চরিত্রের ইনার লজিক ব্যহত হত । বিনোদিনীর সঙ্গে তার মানসিকতার তফাৎ ঘটে গেছে অনেকখানি। শচীশ যে অনিশ্চিতের সাধনায় ডাক দিয়েছে দামিনীর নিজের ভেতরে তার কোনো তাগিদ ছিল না। শচীশের কথা শুনে এভাবে জীবন কাটাতে চাইলে তার মধ্যেকার ফাঁকি যে কোনো মুহূর্তে ঘুমন্ত আগ্নেগিরির মত অগ্নুপাত ঘটাতো । দামিনী এদের চেয়ে নিজেকে বেশি জানত ।

স্বামীর ব্যাভিচার সইতে না পেরে নবীনের স্ত্রী আত্মহত্যা করলে শচীশের কাছে দামিনীর জ্বলন্ত প্রশ্ন সে বুঝে নিতে চায় শচীশরা যা নিয়ে দিনরাত মেতে আছে "তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?

. . . তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?"[৩২] শচীশেরও এই প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না ।

দামিনীর সংকট মোচনে দরকার ছিল শ্রীবিলাসের মতো একজন বন্ধুর । সে দামিনীর পাশে দাঁড়িয়েছে তাকে বিয়ে করে জীবনকে স্থিতি দিয়েছে । জীবনে এই প্রথম ভালোবাসা পাবার, ভরসা করববার একটা জায়গা সে পেল । দুটি পরিণত নরনারীর মিলন শ্রবিলাস দামিনীর বিবাহ; তারা পরস্পরকে জেনে বুঝে গ্রহণ করেছিল। মৃত্যুর সময়ে দামিনী আরো একবার তার সম্পূর্ণ না হওয়া জীবন তৃষ্ণাকে প্রকাশ করেছে ;"সাধ মিটিল না জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই ।"[৩৩]

একালের মেয়েদের ভাবনায় দামিনী পেরেছে অন্য মাত্রা সংযোগ করতে । তাদের কারো কারো মনে হয়েছে "she is the symbol of the social change and advancement of women that had started taking place in the early decades of this centurry"[৩৪]

নারী বিষয়ক আলোচনায় ছোট গল্প স্ত্রীপত্রের মৃণালের যে ভূমিকা যোগাযোগ উপন্যাসে প্রায় একই ধরনের গুরুত্ব কুমুদিনী চরিত্রের।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর লেখা 'কুমুর বন্ধন' বইয়ে যোগাযোগ উপন্যাসের আলেচনা করেছেন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে । তাঁর কাছে কুমুর বন্ধনের প্রকৃত কারণ হল নতুন বুর্জোয়া মধূসূদনের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের শেষ বেলার প্রতিনিধি বিপ্রদাসের সংঘাত । এখানে নতুনের সঙ্গে পুরাতনের বিরোধ বেধেছে । তাঁর কথায় ," . . . নতুন এখানে যথেষ্ট নতুন নয়, পুরাতনও নয় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুরাতন । . . . পরাধীন দেশের বুর্জোয়া সে, (মধুসূদন) স্বাধীনভাবে বিকশিত হয় নি, জাতীয় বুর্জোয়ার চরিত্র লাভ করে নি । সামন্তবাদকে বিদীর্ণ করে তার উদ্ভব নয় জমিদার বিপ্রদাসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তার নিজের কাছে পারিবারিক কলহ একটা । (এ দ্বন্দ্বের নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বিষয়ে সে একেবারেই অজ্ঞ।)"[৩৫]

তিনি আরো বলেন,''কুমুর সঙ্গে মধূসূদনের বিরোধ তাই একদিকে (অংশত) স্বামী-স্ত্রীর কলহ, নতুন ও পুরাতনে বিরোধ, শহর ও গ্রামে শত্রুতা, তেমনি আবার অন্যদিকে, এবং মূলতঃ, দু'টি আর্থ-সামাজিক, যদিচ অবিশুদ্ধ শ্রেণীর লড়াই ।''[৩৬]

তাঁর আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে সমাজে দুই অসম শ্রেণীর লড়াই । কুমুর কষ্ট সেই সমাজেরই সৃষ্টি । তা সত্বেও কুমুর আছে কিছু নিজস্বতা । দুই পুরুষ মানুষের দ্বন্ধে সে অসহায় নারী মাত্র নয়, সে কথাও মনে রাখতে হবে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'কুমুর বন্ধন' বইটার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল কেননা কুমুর বন্ধনকে সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে একটা সম্পূর্ণ বই তিনি লিখেছেন সেদিক থেকে তার আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

'নারীর ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য 'যোগাযোগের বিষয়'[৩৭] সেদিক থেকেই কুমুর চরিত্র বিশ্লেষণ করা দেখা হবে । বিবাহের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের নিজস্ব মতামত তৈরি হয়ে যায় । কুমুর বিয়ে হয়েছে উনিশ বছর বয়সে । এই উনিশ বছর দাদা বিপ্রদাসের সহচর্যে শিক্ষায় সংগীত চর্চায় তার সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে । লক্ষ করবার বিষয় ইংরেজি স্কুল কলেজে পড়া আধুনিক মন নিয়ে কুমু স্বামীর ঘর করতে আসে নি । 'কুমুদিনীর মন একালের ছাঁচের নয় ।'[২৮] আলো আঁধারি স্বপ্নের জগতে তার বাস । স্বামীকে ভক্তি করা এবং সংসারে নিজেকে সতীলক্ষ্মী রূপে প্রতিষ্ঠা করার আদর্শে তার অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস । এই ঐতিহ্যানুসারী নারী বাস্তবের চাপে পরিবর্তিত হয়ে এমন জায়গায় পৌঁছল যেখানে মাতৃত্বকে অস্বীকার করতেও তার বাধে না।

''দুই বংশের পুরুষানুক্রমিক বিরোধের অভিশপ্ত ইতিহাস এ- উপন্যাসের পটভূমি ।''[২৯] পুরানো বিরোধে বিপর্যস্ত ঘোষাল পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত বিত্তবান মধূসূদন কুমুকে বিয়ে করতে চেয়েছিল প্রতিহিংসা বশত । প্রথম থেকেই কুমু এবং মধূসূদনের পার্থক্য স্পষ্ট । মধূসূদন বিয়ে করে নুরনগরের চাটুজ্জেদের মেয়ের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চাইবে; কুমু স্বামী নামক আইডিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়ে পদে পদে অপমানিত হবে-এই তার ভবিতব্য । নারীর বিবাহিত জীবনে অপমান ও অসম্মান কতদূর যেতে পারে নিজের মেয়েদের জীবন দেখে সে কঠিন বাস্তবের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল । এই উপন্যাস লেখার সাত আট বছর আগে তাঁকেও প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল নিজের ছোটো মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে মানসিকতার যোজন পরিমাণ ফারাক। দু একটা চিঠির টুকরো উদ্ধৃত করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

''এবার মাদ্রাজে যখন দেখলুম মীরা তোমাকে ভয় করে, তোমার হাত থেকে প্রকাশ্য অপমানের সংকোচে একান্ত সঙ্কুচিত হয়, তখন স্পষ্ট দেখতে পেলুম তোমাদের দুজনের প্রকৃতির মূল সুরে মিল নেই।'' (৮ ভাদ্র ১৩২৬)[৪০]

জামায়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন ,''তোমার অধৈর্য অসহিষ্ণুতা, তোমার আত্মসম্বরণে অসাধ্যতা' তোমার দুর্দান্ত ক্রোধ এবং আঘাত করিবার হিংস্র ইচ্ছা সাংসারিক দিক থেকে অনেক সময়ে আমাকে কঠিন পীড়া দিয়েছে। ''(১১অগ্রহায়ণ,১৩২৬)[৪১]

মেয়েকে দুঃখ বহন করতে দেখে ব্যথিত পিতা লিখেছেন, ''মীরা যে প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিঃশব্দে আপন দুঃখ বহন করে তাতে ওর মুখের দিকে তাকালে আমার চোখে জল আসে । ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে কোনো জীবনযাত্রা বহন করতে যদি প্রস্তুত হতে হয় তবে সে চিন্তা আমার পক্ষে দুর্বিসহ।''[৪২] (২০ ফাল্গুন ১৩২৬)

''মীরা দেবী স্বামীর ঘরে না থেকে বাবার কাছে থাকলে লোকনিন্দার আশঙ্কা প্রকাশ করে নগেন্দ্রনাথ কবিকে লিখলে তিনি জবাবে লিখেছেন ,'' মীরা তোমার কাছ থেকে দূরে থাকলে তোমার সম্বন্ধে লোকনিন্দার আশঙ্কা আছে বলে তুমি কল্পনা করচ। মীরা নিজের সম্বন্ধে লোক নিন্দাকে গ্রাহ্য করে না তোমাকে লিখেচে শুনে আমি খুসি হলুম। জীবনে সব মানুষের ভাগ্যে সুখ থাকে না --- তা নাই থাকল --- কিন্তু স্বাধীনতা যদি না থাকে তবে তার চেয়ে দুর্গতি কিছু হতে পারে না। মীরা এখানে আপন মনে একটি কোণে থাকে ---- বেশি কিছুই চায় না --- একটুখানি শান্তি এখানে পায়, আর জানে আমি ওকে কত স্নেহ করি । লোক নিন্দার ভয়ে মীরার এই অধিকারটুকুকে নষ্ট হতে দেখলে আমার আর দুঃখের অন্ত থাকবে না।'' (মাঘ - ফাল্গুন ১৩২৯) [৪৩]

পিতৃগৃহ এবং স্বামীঘরের এই দুস্তর ব্যবধান, মেয়েদের বিবাহিত জীবনের অগৌরব অবমাননার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় যোগাযোগের কুমু চরিত্রে প্রতিফলিত হবে এমনই মনে হয়।

শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর ব্যবহারে কুমুর মনে প্রথমেই প্রশ্ন জেগেছিল, ''আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না ?'' মোতির মার উত্তর, 'না, রইল না। যা- কিছু রইল তা স্বামীর মর্জির উপরে। জান না, চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে ।'' [৪৪] কালিদাসের কাব্য পড়া মেয়ে স্ত্রী অর্থে দাসী, শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়। মেয়েরা স্বামীর কাছে যা হারায় তা আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা । মানুষের মনুষত্বের সবচেয়ে সংবেদনশীল জায়গায় আঘাত পায় মেয়েরা । নারীর সামাজিক মুক্তি, পুরুষের সঙ্গে সমনোধিকারে প্রশ্নের জটিলতায় না ঢুকেও একটা সাধারণ মেয়ের ভিতরে প্রতিরোধ জেগে ওঠে এখান থেকে। সামন্ততন্ত্র বুর্জোয়াতন্ত্র সমাজতন্ত্র এমন কি তথাকথিত গণতন্ত্রেও মেয়েদের অবস্থা এক । কোথাও আবরণ আছে কোথাও নেই।

এক সময় রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন মেয়েরা স্বামী নামক আইডিয়ার কাছে নত হয়, বাস্তবের মানুষটার বিচার করতে বসে না। তাঁর ভাবনা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্বামী সহবাস কুমুর কাছে হয়ে উঠেছে আন্তরিক 'অসতীত্ব'। ''কুমু কিন্তু স্বামীর শয্যায় গিয়েছিল দৈব- অনুজ্ঞায় । কিন্তু সেই কলুষিত সম্ভোগের গ্লানি দিয়ে বুঝল প্রথার চেয়ে, দৈব্যনির্দেশের চেয়েও বড়ো নিজত্ব, স্বকীয়তা, প্রাতিস্বিকতা।''[৪৫]

মধুসূদনের - দেখা মেয়েরা ''ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে ।. . . ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা

অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়ার ও হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, একথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিকের এক কোণেও স্থান পায় নি;" [৪৬]

নারী কে প্রচলিত ভূমিকার বাইরে দেখতে অভ্যস্ত নয় সমাজের অধিকাংশ পুরুষ মানুষ, মধসূদন তাদেরই প্রতিনিধি । কুমুর অলৌকিক শারীরিক সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ, কুমুর স্বভাবের আভিজাত্যকে সে ধরতে পারে না তা নয় । কিন্তু স্ত্রী বলেই তাকে সে নিজের অহংকারের কাছে নত করতে চায় । কুমুর প্রতি হঠাৎ আনুগত্য দেখানো, ভালোবাসা, মুগ্ধ হওয়া তাতেও কুমুকে আয়ত্ত করতে না পেরে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হওয়া রূঢ় বাক্যে ও ব্যবহারে কুমুকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করে করে নিজের অহংকার ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে মধুসূদন। একধরনের সার্থকতা ও সে পেয়েছে; কুমুকে বাধ্য করেছে ঘোষাল বংশের উত্তরাধিকারীকে গর্ভে বহন করতে । এই সার্থকতা নিতান্তই জৈবিক।

কুমুর পরিণতি জানবার আগে তার মায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার । কুমুর বাবা বারে বারে স্খলনের মধ্যে দিয়ে তার মাকে সকলের কাছে অসম্মানিত করেছেন । প্রতিবারই স্ত্রীর কাছে মাপ চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতেন তিনি, কিন্তু ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হত না । কুমুর মা এই অপমান সহ্য করতে না পেরে স্বামীকে ত্যাগ করে একবার বৃন্দাবনে চলে যায়; ঘটনার আকস্মিকতায় কুমুর পিতার মৃত্য হয়। কুমুর মা ফিরে এসে অনুশোচনায় মারা যান কিছুদিনের মধ্যে । এই ঘটনা দু-ভাইবোনয়ের মধ্যে দু ভাবে প্রতিক্রিয়া করে । কুমু বাবাকে বেশি ভালোবাসত । বাবার এই নিদারুণ পরিণামের জন্য সে মাকেই মনে মনে দায়ী করেছিল । আধুনিক মানুসিকতা সম্পন্ন বিপ্রদাসের চোখে কিন্তু ঠিকই ধরা পড়েছিল । ". . . বার বার স্খলনের দ্বারা তার মাকে তিনি সকলের কাছে অসম্মানিত করতে বাধা পান নি এটা সে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারল না । তার মা ও ক্ষমা করেন নি বলে বিপ্রদাস মনের মধ্যে গৌরব বোধ করত।" [৪৭] কিন্তু সেকেলে কুমুও বড় হয়ে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে বুঝতে শিখল স্বামী বলেই তাকে সব স্খলন ত্রুটি সমেত বহন করা চলে না। তার মা স্বামী গৃহ ত্যাগ করেছিল, সে ও স্বামীর ঘরে আর ফিরে না যাবার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারল। মা মেয়ের ঘটনাকে পাশাপাশি রেখে দেখলে কুমুর পরিবর্তনকে বোঝা যাবে । মা-র মনে স্বামীর মৃত্যুর জন্য অনুশোচনা হয়েছিল । কুমুর তা হয় নি । অনভিপ্রেত মাতৃত্বের দায় মেনে নিয়ে শেষ অবধি কুমুকে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে হল, আপাত দৃষ্টিতে এটা কুমুর পরাজয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যা উদ্দেশ্য ছিল কুমুর মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারলেন। মাতৃত্বই হচ্ছে মেয়েদের সমাজের দেওয়া সবচেয়ে গর্বের পরিচয় । রবীন্দ্রনাথও চিরদিন মেয়েদের মাতৃত্বকে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসিয়েছেন । মাতৃত্বের মহিমাময় রূপের ধারণা বাঙালির সংস্কারে এত দৃঢ় যে তাকে অস্বীকার করা বা সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা সামাজিক অপরাধের পর্যায়ে পরে। এমন ধারণাই বরং প্রচলিত মাতৃত্বেই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় । মেয়েদের মনে ও এধারণা দৃঢ় মুল বিস্তার করেছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কুমু প্রশ্ন তুলল সেই পরিচয়ের সারবত্তা নিয়ে । কুমু জানে সমাজের হাতে সংসারের হাতে ঐ একটা বাঁধনই আছে মেয়েদের আষ্টে পৃষ্টে বাঁধার জন্য। এই টুকুই ওরা করতে পারে কিন্তু তারপর । তাই কুমু প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারে, " . . . ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোওয়ানো যায় না।" [৪৮]

ভাবপ্রবণ বাঙালি সমাজে এই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন তোলার সাহস দেখাতে পারলেন রবীন্দ্রনাথ । সতীত্ব মাতৃত্বের গরিমা ছাড়া মেয়েদের আর কোন পরিচয় আছে এই অন্বেষণের ইচ্ছা জাগিয়ে দিলেন

মেয়েদের মনে । সমাজকে জানিয়ে দিলেন নির্দিষ্ট ছকে বন্দী করে রাখা যাবে না এযুগের নারীকে । ''মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না ।''[৪৯] এই হচ্ছে কুমুর শেষ কথা।

শেষের কবিতা উপন্যাসের নায়িকা লাবণ্য শিক্ষাদীক্ষায় বুদ্ধিতে সৌন্দর্যে রুচির অভিজাত্যে আধুনিক কালের মেয়েদের আদর্শ ঃ ''লাবণ্য তো এক আশ্চর্য সৃষ্টি । দেশজ সংস্কৃতির প্রাণরসে পূর্ণ এক মানবী, কী সাবলীল ভঙ্গিমায় বিলিতি কেতার অনুসরণকারী কেটি মিত্তিরদের কৃত্রিমতাকে ম্লান করে দিতে পারে।'' [৫০]

শিলং এ রোমান্টিক সৌন্দর্যে ভরা পাহাড়ি পথে আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় অমিত - লাবণ্যের পরিচয় হয়েছে। অনুকূল পরিবেশে ভালোবাসাবাসি হতে সময় লাগে নি। প্রেমের ভিতর দিয়ে দুই চরিত্র্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে । রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের মধ্যে লাবণ্যই প্রথম ধনী পরিবারে শিক্ষায়িত্রীর চাকুরী নিয়ে নিজের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে । অভিভাবিকা এবং লাবণ্যের চাকুরীদাত্রী যোগমায়া দেবী অমিতের উচ্ছ্বসিত প্রেম দেখে এবং লাবণ্যেকে বিয়ে করতে চায় শুনে মন্তব্য করেছেন, এর আগে বিয়েতে মেয়েদের কোনো মতামত ছিল না, সেকালে 'তারা ছিল খেলার পুতুল' কিন্তু একালে মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে বেশিবয়সে বিয়ে করেছে সুতরাং তাদের নিজস্ব মতামতের মূল্য রয়েছে। কিন্তু অমিত কে তাঁর মনে হয়েছে অপরিণত ঃ '' 'বাবা বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্য বিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।' ''[৫১]

যোগমায়ার থেকেও অমিতকে আরো ভালভাবে চিনেছিল লাবণ্য। . . .''লাবণ্য রবীন্দ্রনাথের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যতিক্রম। দামিনী যেমন বলেছিল উত্তুরে হাওয়াকে সে সিকি পয়সা খাজনা দেয় না, লাবণ্য তেমন কথা বলার অধিকারী নয়। তথাপি লাবণ্য দামিনীর থেকে বস্তুতান্ত্রিক। এই মধ্যবিত্ত আত্মনির্মিত মেয়েটির বৌদ্ধিক জগতের মাটিতেই আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল অমিতের রোমান্সের রঙিন পান পাত্রটি।''[৫২] দুজনের প্রেমকে কাব্যে গেঁথে ছন্দে দুলিয়ে মোহনীয় করে তুলেছিল অমিত। কিন্তু লাবণ্য ঠিকই বুঝেছিল ঃ ''যতই আমার আলো থাক আর ধ্বনি থাক, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।''[৫৩]

অমিতের সঙ্গে কেতকীর সম্পর্কের কথা জানবার পরে লাবণ্য ঈর্ষা বোধ করেনি, চায় নি অমিতের উপর ভালোবাসার অধিকার জাহির করতে। অমিতের অবহেলায় কেতকী মিত্রের কেটি মিটারে রূপান্তরকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেছে। আরও একটা মেয়ের ভালোবাসার অপমানকে মেয়ে হয়ে সে উপলব্ধি করেছে। অমিতের মধ্যে যে মধুকর বৃত্তি আছে তাকে সংযত করে কেতকীর কাছে অমিতকে ফিরিয়ে দিয়েছে লাবণ্য।

অমিত নিবারণ চক্রবর্তীর ছদ্ম নামে অনবরত কাব্য করে গেছে লাবণ্যকে নিয়ে। কিন্তু শেষের কবিতাটা এসেছে লাবণ্যর কাছ থেকে তার বিয়ের খবরের সঙ্গে একই চিঠিতে। সেই কবিতাটা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে লাবণ্য নামের মেয়েটির পরিচয়।

লাবণ্য বিয়ে করেছে তার বাবার পুরনো ছাত্র লাবণ্যের প্রতি অনুরক্ত শোভনলালকে। প্রেমিক হিসেবে দুজনের মধ্যে তফাৎ হল অমিত ভালোবাসার কথার স্রোতে লাবণ্যকে ভাসিয়ে দিলেও লাবণ্য

তার জীবন থেকে সরে যাবার পর সে কেতকীর কাছে ফিরে গেছে এবং বিয়েও করেছে, শোভনলালের নিরুচ্চার ভালোবাসা লাবণ্যর কাছে প্রতিহত হয়েছে, লাবণ্যকে পাবে না জেনেও সে বিয়ে করার কথা ভাবে নি। লাবণ্য ফিরে আসতে পেরেছে তার কাছে "যে আমারে দেখিবারে পায়/ অসীম ক্ষমায়/ ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি, "[৫৪] অমিতের কাছে সে অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা হয়ে থাকতে চায় নি।

লাবণ্যের চরিত্রে রয়েছে আধুনিকতার আরো এক অভিজ্ঞান। এতকাল কর্ম জগতের কথা, বিশ্বলোকের ধারণা ছিল পুরুষদের এক চেটিয়া; এখানে দেখা গেল মেয়েদেরও তেমন কিছু থাকতে পারে। শেষের কবিতায় লাবণ্য লিখেছে ঃ

"আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই ---
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।"[৫৫]

রবীন্দ্রনাথ আধুনিককালের মেয়েকে যতটা সাবলীল বুদ্ধিদীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ী দেখতে চাইতেন তার সবটুকু ঔজ্জ্বল্য নিয়ে লাবণ্যের চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে।

দুইবোন (১৯৩৩) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে একটা পরীক্ষা করেছেন মেয়েদের স্বভাবের দুই ধরণ নিয়ে। মায়ের জাত আর প্রিয়ার জাত। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র তিনটি শর্মিলা শশাঙ্ক ও উর্মিলা। গ্রন্থটির মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বিচিত্রা'র একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,". . . সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুইয়ের মিশোল। বাংলা দেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মাতৃ অঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। . . . আবার এমন পুরুষও নিশ্চয় আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসে না। তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ। . . .

শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্য স্নেহ-সতর্ক মাকে পেয়েছিল। তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় উর্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত লাগল, ট্র্যাজেডি ঘটলো। অপর পক্ষে অতি নির্ভরলোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে। . . . তারা চায় পতিগুরুকে, পদধূলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু তার বিপরীত জাতীয় মেয়েও নিশ্চয়ই আছে অতিলালন অসহিষ্ণু পুরুষকেই চায়, যাকে পেলে তার নারীত্ব পরিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে উর্মি সেই জাতের মেয়ে। . . . এমন এক পুরুষকে পেলে যার চিত্ত অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল স্ত্রীকেই, যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই --- যে যথার্থ তার জুড়ি।

. . . ভাগ্যের অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হয়ে উঠলো।"[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ নারীর ভালোবাসার প্রবৃত্তির উপর জোর দিয়েছেন বেশিরভাগ, তবু জীবনের শেষলগ্নে পৌঁছে তাঁর মনে হয়েছে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের সমতা আনতে মেয়েদের বৌদ্ধিক দিকটার প্রয়োজন খুব বেশি। শুধু ভালোবাসাবাসি নয়, বুদ্ধিগত ঐক্য থাকাও একান্ত প্রয়োজন, তাতেই নারী এবং পুরুষ যথার্থ সার্থকতা লাভ করতে পারে। যতদিন গেছে তাঁর এই মনোভাব দৃঢ় হয়েছে। পরবর্তীকালে

লেখা 'লেবরেটরি' গল্পের 'নন্দকিশোরের মত হল, ''স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা কুটনি, এটা মানবশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।''[৫৭] সমতার প্রয়োজন শুধুমাত্র পুরুষের দিক থেকে নয়, নারীর দিক থেকেও। 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য শেষ অবধি অমিতকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি তার বুদ্ধির অপরিণতির জন্য এবং 'বাঁশরি' নাটকে বাঁশারি সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে যদি বিয়ে করতে হত তাহলে সেটা তার কাছে ছিল আত্মহত্যার তুল্য। 'দুইবোন' উপন্যাসের উর্মিলা চরিত্র আলোচনা করলে জানা যাবে নারী পুরুষের সমতা বলতে নারী চরিত্রের কোন কোন দিকগুলি প্রাধান্য পেয়েছে।

শশাঙ্ক স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাতের মেয়ে। তার সমস্ত চিন্তা ছিল স্বামীকে ঘিরে। শর্মিলা গৃহবধূ বাইরের জগতে পুরুষের কাজে সহায়তা করবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি তার ছিল না। শশাঙ্কের মঙ্গলের জন্য সে সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল। তার তীব্র অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে বুঝবার ক্ষমতা অন্যের তুলনায় বেশি ছিল, সে হয়তো কিছুটা ট্র্যাডিশনাল তা সত্ত্বেও শেষ অবধি চরিত্রের দৃঢ়তা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। 'শর্মিলা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গৃহকল্যাণী।'[৫৮] অপত্য স্নেহে লালিত হতে অভ্যস্থ শশাঙ্ক ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠেছিল। সে চাইছিল এমন মেয়ে যে তার মানস-লোকের সঙ্গী হবে।

অন্য দিকে উর্মিমালা পতিগুরু কে নয়, যার সঙ্গে সমানে সমানে মেলামেশা করা যায়, ভাবের আদান প্রদান করা যায়, মন খুলে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা যায় এমন এক সঙ্গী চেয়েছিল। কিন্তু তার জুটেছিল বাবার নির্বাচিত ডাক্তার নীরদ। নীরদের গম্ভীর ও নীরস প্রকৃতি উর্মির জীবনোচ্ছল সরস স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। শর্মিলার অসুস্থতার সুযোগে দিদির সেবা করতে এসে শশাঙ্ক ও উর্মিমালা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এল। উর্মি সংসারের কাজে পটু নয়, কিন্তু ''নিজেকে দিয়েই এ বাড়ির অনেক দিনের মস্ত একটা অভাব পূরণ করেছে -- সেই অভাবটা ঠিক যে কী তা নির্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না। তাই, শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন সেখানকার হাওয়ায় খেলানো একটা ছুটির হিল্লোল অনুভব করে। সেই ছুটি কেবল ঘরের সেবায় নয়, কেবল অবকাশ মাত্রে নয়, তার একটা রসময় স্বরূপ আছে।'' [৫৯] যা কর্মকান্ত শশাঙ্কর রক্তকে দোলায়িত করে। এ তো গেল শশাঙ্কর উপলব্ধি। নীরদের কঠোর শাসনে উর্মির সজীব স্বভাব মরে যেতে বসেছিল। ''উর্মির চরিত্র বললে যে পদার্থটা বোঝায় অন্তত তার প্রথম বন্ধকী দলিল নীরদেরই সিন্ধুকে।''[৬০] দামিনী যেভাবে বলেছিল ঠিক সেভাবে নয় তবে উর্মিও নিজের মতো করে বেরিয়ে আসতে চায় এই কঠিন বাঁধন থেকে। তার ''মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। . . . হঠাৎ মনটা খেপে ওঠে, ইচ্ছে করে অত্যন্ত একটা দুষ্টুমি করতে, চেঁচিয়ে বলতে 'আমি কিচ্ছু মানি নে'।'' [৬১] নীরদের কাছে উর্মি নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিব্রত। ''অপরপক্ষে শশাঙ্ক ঊর্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ঊর্মিকে আনন্দ দেয়। এতকাল সেই সুখটাই ঊর্মি পায় নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুশি করতে পারে এই তথ্যটি অনেকদিন তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল, এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।''[৬২] স্বভাবের বুড়োমি রবীন্দ্রনাথ কখনোই পছন্দ করতেন না; ঊর্মির স্বভাবে ছিল ছেলেমানুষি। যা জীবনকে সুন্দর ভাবে উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। ঊর্মি ঘুরতে বেড়াতে ভালোবাসতো, তাস খেলা, হোলি খেলায় শশাঙ্কর কাজের জায়গা পরির্দশন জীবনের সব দিকে তার ঝোঁক ছিল। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের কল্যাণী নারী করে তোলবার দিকেই জোর দেন নি তিনি চেয়েছিলেন সব দিক দিয়ে মেয়েরা যেন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মধ্যেও সেই প্রবণতা দেখা যায়। ঊর্মির স্বভাব জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন, ' ঊর্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়,' এই কথার মধ্যে দিয়ে মেয়েদের পরিবর্তনের আভাস দিয়ে

রাখলেন। ঊর্মির ছেলেমানুষি বাদ দিলে যা থাকে সেখানে চমক এবং পরিবর্তন আরো গুরুতর। শশাঙ্ক যখন বাড়ি তৈরির প্ল্যান নিয়ে বসে, ঊর্মিও পাশে বসে জানতে চায়; বুঝতেও পারে সহজে, গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল ঠেকে না। শশাঙ্ক খুশি হয়ে উঠে, ওকে প্রবলেম দেয় ও কষে নিয়ে আসে। জুট কোম্পানির কাজে শশাঙ্ক স্টীমলঞ্চে করে মাপ জোখ করতে বের হলে ঊর্মিও সঙ্গে যায়; শুধু যায় না মাপ জোখ নিয়ে তর্কও করে শশাঙ্কর সঙ্গে; "শশাঙ্ক পুলকিত হয়ে উঠে। ভরপুর কবিত্বের চেয়ে এর রস বেশি। . . . লাইন টানা, আঁক কষার কাজে তার সঙ্গী জুটেছে। ঊর্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাজ এগোয়। . . . এইখানটাতে শর্মিলাকে রীতিমত ধাক্কা দেয়। ঊর্মির ছেলেমানুষিও সে বোঝে, তার গৃহিণীপনার ত্রুটিও সস্নেহে সহ্য করে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীবুদ্ধির দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য বলে মেনে নেয়েছিল --- সেখানে ঊর্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা নিতান্তই স্পর্ধা।"[৬৩] শর্মিলা যাকে স্ত্রীবুদ্ধি বলেছে তা আসলে পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় পুষ্ট মেয়েদের জন্য বরাদ্দমাপা সীমিত বুদ্ধি এর বাইরে যাওয়ার অর্থ মেয়েদের স্বধর্ম ত্যাগ - মেয়ে হলেই তাকে অল্পবুদ্ধি হতে হবে। শর্মিলা আর ঊর্মিলার মধ্যে জাতিগত পার্থক্য কেবল নয় গুণগত পার্থক্যও ঘটে গেছে। নারী পুরুষের সমতায় নারী স্বভাবের এই পরিবর্তন ছিল রবীন্দ্রনাথের কাম্য।

ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ এর আগেও লিখেছিলেন। সেখানে কাহিনীর সমাপ্তিতে মুখ্য ভূমিকা ছিল পুরুষের। 'দুই বোন'- এর গল্পও ত্রিভুজ প্রেমের শর্মিলা আর শশাঙ্কর মাঝে এসে পড়েছে ঊর্মিলা। এই জটিল পরিস্থিতিকে দুজন নারী দুভাবে সমাধান করতে চাইল। শশাঙ্ক ঊর্মিমালার মধ্যে প্রেমের কথা জানতে পেরে শর্মিলা মনে নিদারুণ দুঃখ পেলেও স্বামীর সুখের জন্য বোনকে সতীন করে নিতে চাইল। ঊর্মির পক্ষে এ প্রস্তাবে রাজী হওয়া নিতান্ত অসংঙ্গত ব্যাপার। প্রেমে পড়েছে সে নিজের অজান্তে, শশাঙ্কর সঙ্গে তার চরিত্রগত মিল এর অন্যতম কারণ। ঘোর কেটে যাবার পর বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে তার দেরি হয় না। এই অনাভিপ্রেত পারিবারিক জটিলতা থেকে সকলের মুক্তির জন্য সে একাই চলে যায় বিলেতে ডাক্তারি পড়তে। রবীন্দ্রনাথের আগের নায়িকাদের পিছনে ফেলে ঊর্মি এগিয়ে যায় অনেক দূর সে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই নেয়। ডাক্তারি পাশ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। জীবনের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিখেছে "কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি। আর সুখ যদি না হয় তো নাই হল। ভুল করতে ভয় করি।"[৬৪] 'দুই বোন' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদার রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন,"প্রতিকূল বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করে-করে নারীর এই যে আত্মপ্রতিষ্ঠা আদায়ের সংগ্রাম, তার ইতিহাসকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেও রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন, ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি আধুনিক মনের অধিকারী।"[৬৫]

চার অধ্যায় (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়িকা এলা অপূর্ব সুন্দরী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে গবেষণা করছে। এলার 'জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে।'[৬৬] শৈশব থেকে সে দেখেছে বাতিকগ্রস্ত অসংযত মা-র কাছে উচ্চশিক্ষিত বাবা প্রতিনিয়ত অসম্মানিত হয়েছে। কলহপরায়ণ প্রভুত্বকামী মায়ের শাসনের বিরোধিতা করতে গিয়ে 'এলার মন অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকেছে।'[৬৭] মেয়ের ব্যবহারে 'কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ' দেখে এলার মা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এ মেয়ে শাশুড়িকে জ্বালাতন করবে, মার কাছে এসব শুনে এলার ধারণা হয়েছিল,"বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে, ন্যায়-অন্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।"[৬৮] বিয়ের প্রতি এলার মনে স্বভাবতই বিরাগ জন্মেছিল। মা বাবা মারা যাবার পর কাকার আশ্রয়ে এসে এলা বুঝতে পারে এখানে সে অবাঞ্ছিত। যেমন তেমন একটা বিয়ে করে আশ্রয় খুঁজে নিতেও তার শিক্ষিত রুচিতে

বাধে। মনে হয় অতীনের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কারো প্রতি এলা আকর্ষণ অনুভব করে নি। কাকার সংসার থেকে বেরিয়ে এসে সে স্বাধীনভাবে থাকতে চাইছিল। নিরাপত্তার ঘোরাটোপ ছেড়ে মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে আসবার ঘটনা আজকের দিনেও বিরল, এলার মতো সুন্দরী মেয়ের পক্ষে তা বেশ বিপজ্জনক। এমন পরিস্থিতিতে ইন্দ্রনাথের আগমন এলার শহরে। ইন্দ্রনাথের স্পষ্ট কোনো পরিচয় এলার জানা ছিল না; তবু এই আগন্তুকের চরিত্রের তেজ বিদ্যার খ্যাতি অন্য অনেকের মতো এলাকে আকৃষ্ট করেছিল সে বুঝতে পেরেছিল এখানে তার নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত থাকবে। সে সময়টা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, মেয়েরাও তাতে যোগ দিতে ঘর ছেড়েছে। কিছুদিন আগেও পর্দাপ্রথার দাপটে মেয়েদের মেয়েদের বাইরে বেরানো ছিল পুরুষের মর্জির উপর নির্ভরশীল। এলা নিজের ইচ্ছানুযায়ী বাইরের জীবন বেছে নিতে চাইলে তেমন কোন প্রশ্ন জাগল না। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ ইন্দ্রনাথ এলার রূপের দীপ্তি ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখে বুঝতে পারল দলে একে কাজে লাগানো যাবে। সে এলাকে 'নবযুগের দূতী' বলে বরণ করে নিল। দলে শিক্ষিত ধনী শিষ্য থাকলে যেমন গুরুর কদর বেড়ে যায়, এলা নারী তায় শিক্ষিত বুদ্ধিমতী এবং অসাধরণ সুন্দরীও। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রনাথের দলে ভালো ছেলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এলাকে দেখেই অতীনের মতো উচ্চশিক্ষিত জমিদারের ঘরের ছেলে দলে এসেছিল। ইন্দ্রনাথের দলের নিয়ম ছিল এর সদস্যরা কেউ বিয়ে করতে পারবে না। এলা ও অতীন দুজনেই এই শর্ত মেনে দলে এসেছিল। তাদের মধ্যেকার প্রেমের সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এলার জন্য অতীন সব ছেড়েছিল, সেই ছাড়া এমনই নিঃস্ব হয়ে ছাড়া যে জমিদারের ছেলে হয়েও তার দুটোর বেশি জামা ছিল না। মেয়েদের জন্য পুরুষের এতখানি স্বার্থত্যাগ সাধারণত দেখা যায় না।

''নারীকে উপন্যাসের নায়িকা মাত্র না ভেবে তার গোটা ব্যক্তিত্বের সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন, শুধু উপন্যাসের ঘটনাটুকুর জন্যই তাদের মূল্য, এমনভাবে তাদের কল্পনা করা হয় নি। তাঁর নায়িকাদের বুদ্ধি-দীপ্ত জীবন যাত্রা এইভাবে জীবনের বাস্তব পরিবেশ থেকেই চলবার শক্তি পেয়েছে।''[৬৯] এলার চরিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। এলার মতো মেয়ে রাজনীতির আবর্তে এসে পড়েছিল নিজের স্বাধীন থাকার ইচ্ছেকে রূপ দিতে গিয়ে, নিজে উর্পাজন করে স্বাবলম্বী হতে ছেয়েছিল। জীবন নিয়ে এলা কি করবে সে বিষয়ে তার স্বচ্ছ কোনো ধাবণা তখনো তৈরি হয় নি। অথচ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে এমন পণও করে নি। তার লক্ষ্য স্থির হয়ে গেলে তার এবং অতীনের মধ্যে সম্পর্কের কোনো জটিলতা তৈরি হত না। এলার মধ্যে প্রেমের স্বাভাবিক আকাঙ্খা থেকে গিয়েছিল তাই দলের অন্যান্য ছেলেদের কাছে সে স্নেহময়ী দিদি হলেও অতীনের কাছে প্রেমিকা হতেই চেয়েছিল। এলা এবং অতীন দুজনেই দলে এসেছিল বিয়ে করবে না এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে।

পিছন ফিরে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে আগের নায়িকাদের তুলনায় এলার বিশিষ্টতা কোথায়। এলা এবং অতীন দুজনেরই বয়স আঠাশ। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখতে শুরু করেছিলেন সেটা ছিল বাল্যবিবাহের যুগ, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান ছিল অনেকখানি। সেটা কমতে কমতে সমান হয়ে গেছে। বিদ্যার্জনে এলা বেশ এগিয়ে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে খুব কম সংখ্যক ছেলে মেয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য গবেষণাধর্মী পড়াশোনা করে, এলা তাও শুরু করেছিল বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা। বিয়েই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য অন্তত মেয়েদের ক্ষেত্রে এমনই ভাবা হত, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো নায়িকা এবং চার অধ্যায়ের এলা তা থেকে স্বেচ্ছায় দূরে থাকতে চেয়েছিল। বিয়েই নারী জীবনের একমাত্র পরিণতি এই ধারণা থেকে তারা সরে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনায় মেয়েদের জীবনবোধের অন্যতর চেহারা উঠে আসছিল। কিন্তু কবি বলেই মানবিক সম্পর্কের

মূল শক্তিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। যে কোনো মানবিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল ভালোবাসা, তাকে প্রেম স্নেহ-মমতা যে নামই দেওয়া হোক না কেন। এতকাল এই মূল শক্তিকে একটা দায়িত্বের মতো চাপানো হত মেয়েদের উপরে, যেন ভালোবাসার শক্তির দায় বহন করায় নারীত্বের চরম সার্থকতা; পুরুষেরা তা ভোগ করবে কিন্তু তাদের থাকবে না কোন দায়। এই চেনা ছকটা ইতিমধ্যে বদলাতে শুরু করেছে। পুরুষের ভালোবাসায় ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার সঙ্গে মিশে থাকে প্রবল প্রভুত্ববোধ। নারী পুরুষের ভালোবাসার অনেক স্তর আছে, সহজে তার সমাধান সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যেটা দেখাতে চেয়েছেন তা হল পুরুষের মধ্যেও রয়েছে প্রেমের দায় বহনের ইচ্ছা।

নারীর প্রতি পুরুষের স্থায়ী মনোভাব হল মোহ। এ থেকে সরে এসে নারীপুরুষের সম্পর্কের ভিতরকার সবটুকু বোঝা যাবে না। এলা এবং অতীনের সম্পর্ক মূলতই প্রেমের সম্পর্ক বলে এবিষয়ে খানিকটা আলোচনা আবশ্যক। অন্তুর যদি এলার প্রতি মোহ থেকে থাকে তাহলে অন্তুর প্রতি এলার মোহও কিছু কম নয়, প্রেমের ব্যাপারে এলার মতো সাহসী নায়িকা বিরল। প্রেমের জন্য নায়িকার আত্মত্যাগ এই ধারণার সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের লেখায় এমন অনেক নায়ক আমরা দেখেছি যারা প্রেমের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বাজী ধরেছে। সেটা নিজের অহংকার চরিতার্থ করার অথবা প্রেমিকার উপেক্ষায় আহত পৌরুষের জ্বালা মেটাবার জন্য নয়। 'ঘরে বাইরে' র নিখিলেশ 'চার অধ্যায়ে' র অতীন সেই ধরনের চরিত্র। এমন কি গোরার মতো অন্যধরনের চরিত্রও নিজের সত্তাকে অনুভব করেছে আনন্দময়ীর ভালোবাসায় সুচরিতার প্রেমে। নারীর জীবনে প্রেম যতটা গুরুত্ব পূর্ণ পুরুষের জীবনে তার চেয়ে কম নয়।

এলার সঙ্গ পাবে বলে অন্তু সব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়েছে। এই অসামান্যা নারীকে সে কোনো কালেই আপন অধিকারে পাবে না জেনেও। এই সব হারানো প্রেমিকের সামনে এলা আর কি করতে পারে নিজেকে সম্পূর্ণ দিয়ে দেওয়া ছাড়া। সে তো দেশোদ্ধারের কোনো ব্রত নিয়ে আসে নি। এসেছিল স্বাধীন জীবন যাপনের তাগিদে কিন্তু Power machinery র চাপের কাছে দুজনেই বন্দী হয়ে পড়েছে। তারা এই দলে সম্পূর্ণ misfit ।

লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বাজী ধরে যে সব মানুষেরা তাদের আত্মোৎসর্গকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখা সম্ভব নয়। আদর্শের জন্য দু-চারজনের নিঃস্বার্থ আত্মবলিদান ব্যতীত সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিংস্রতা ক্ষুদ্রতা নির্মমতার পীঠস্থান হয়ে উঠে। আদর্শবাদের সংকীর্ণ বেদীতে সাধারণ মানুষের জীবন ছিনিমিনি খেলার উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাণ পর্যন্ত দান করছে এই অহংকারে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা এবং কর্মীর কাছে বিরুদ্ধ দলের প্রাণের কানাকড়ি মূল্য থাকে না। সন্ত্রাসবাদের ভিত্তিতে আদর্শ তত মূল্যবান কিছু নাও হতে পারে। ধর্মীয় গোঁড়ামী রাজনৈতিক মতপার্থক্য অথবা একদল ক্ষমতালোভী মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে সন্ত্রাসবাদ। দেশে দেশে কালে কালে তার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যদি আধুনিক মানুষের প্রধান স্বীকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে সন্ত্রাসবাদ সেখানটায় আঘাত করে সব থেকে বেশি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা বা উপযোগিতা নেই এমন কথা বলা উদ্দেশ্য নয়; সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিপথগামী হলে তার ভয়াবহতা নিজেদের লোককেও ক্ষমা করে না। এই আন্দোলনে মানবিকদিকগুলো অবহেলিত হবার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি। জেনে না জেনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে এলা অন্তুর এই পরিণতি স্বাভাবিক। চারিদিকে যে পাঁক ঘুলিয়ে উঠেছে তার থেকে মুক্তি পেতে এলা প্রেমিকের হাতে মৃত্যু বরণ করতে চাইবে।

এলার মতো রূপসী বুদ্ধিমতী মেয়েকে পুরুষেরা কি ভাবে নিতে পারল তা দেখা দরকার। ইন্দ্রনাথ এলাকে চেয়েছে একজন অনুপ্রেরণাদাত্রী রূপে-" 'তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনের কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।' "[৭০] দুভার্গ্য এলার ততোধিক দুভার্গ্য সমাজের এমন একটা অসামান্য মেয়েকে ব্যবহার করতে পারল না, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তাকে অনুপ্রেরণাদাত্রীর ভূমিকায় বসিয়ে রাখল। এখানেই শেষ নয়, চরিত্রের দিক থেকেও ইন্দ্রনাথ তাকে দুর্বল ভেবে নিয়েছিল পুলিশের কাছে ধরা পড়লে দলের গোপন কথা ফাঁস করে দেবে সে। এলাকে দলের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার দলের প্রয়োজনে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করা হয় নি।

অন্তও এলার কাছে পেতে চেয়েছিল নারীর মাধুর্যকে ঃ"তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বল তো তাই বলো, বরদান বল যদি তাও বলতে পার; অহংকার করতে যদি দাও তো করব অহংকার, নম্র হয়ে যদি আসতে বল দ্বারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তুমি আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ তুমি ছোটো করে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ --- দেশকে দিলে আমার হাতে।"[৭১] অন্তর এই ক্ষোভের কারণ কি? সে এলার সৌন্দর্য এবং চরিত্র গরিমায় আকৃষ্ট হয়ে এলাকে ভালবেসে দলে এসেছিল। এলা নিজেও সত্য ভঙ্গ করতে চায় নি। 'দেশের কাছে হোক যার কাছেই হোক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে?'[৭২] এলাকে এই কথা বলার অর্থ কি? প্রেমের ছোট গন্ডির মধ্যে অন্ত এলাকে পেতে চেয়েছিল বলেই তার এই ক্ষোভ। দেশের জন্য কি না জানিনা কিন্তু ভদ্রলোকের প্রতিজ্ঞা রক্ষার অহংকারে সে দল ত্যাগ করতে পারছিল না। এলা খুব দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে অন্তকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে তার সত্যভঙ্গ নয়, সবার সামনে অন্তকে স্বীকার করে নেবার সাহস। দলের সম্মিলিত অন্ধশক্তির বিরুদ্ধে একা মেয়ের বিদ্রোহ।

কেননা ইন্দ্রনাথকে সে অন্যদের চেয়ে ভালো জানত, তাদের দুজনের যৌথ জীবনের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে তা তার অজানা থাকার কথা নয়। জীবনে সে অন্তকে পাবে না অন্তত মৃত্যুতে তাকে পেতে চেয়েছিল-- অন্ত কিন্তু সাহস করে এগিয়ে আসতে পারে নি।

নারী তার নতুন পরিচয় নিয়ে সমাজের বুকে আবির্ভূত হলে সেই আধুনিক নারী ব্যক্তিত্বকে সমাাজবদ্ধ পুরুষ, ঐতিহ্যে বিশ্বাসী পুরুষ কিভাবে ব্যবহার করবে সে তাদের সমস্যা। পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য মেয়েরা বসে থাকতে পারে না তারা নতুন নতুন ভূমিকা তৈরি করে নেবে রবীন্দ্রনাথ শেষ উপন্যাসেও তার পরিচয় রেখে গেলেন এলার চরিত্রে।

উল্লেখপঞ্জি

১. প্রশান্তকুমার পাল/রবীজীবনী-৪ / আনন্দ পাবলিশার্স - ১৩৯৫ পৃ- ১৩
২. Bimanbehari Majumdar / Heroines of Tagore / Firma K.L.M-1968/P-123
৩. তদেব P.127
৪. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাস/দেশ সাহিত্য সংখ্যা-১৩৯৮ পৃ- ১৩৯
৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়/বাংলা উপন্যাসের কালান্তর/দেজ পাবলিশার্স -১৯৮০ পৃ. ১৪৮
৬. রবীন্দ্র রচনাবলী - ৭/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/উপন্যাস চোখের বালি- পৃ. ৩৩৪
৭. তদেব পৃ. ৩৪২
৮. Krishna Kripalani / Rabindranath Tagore: A Biography/ VISVABHARATI 1980/ P- 187
৯. M. Sarada/ Rabindranath Tagore: A study of women characters in his Novels/ sterling publishers/ 1988 New Delhi-P.27
১০. রবীন্দ্রগুপ্ত /উপন্যাসে বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথ/চিরায়ত প্রকাশন-১৯৮৭ পৃ. ৪৭
১১. M. Sarada/ Rabindranath Tagore: A study of women characters in his Novels 1988 New Delhi/ P.69
১২. রবীন্দ্র রচনাবলী-৭৭ প.ব.স./ উপন্যাস- গোরা- পৃ. ৬৪৫
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ সঞ্চয়িতা-বিশ্বভারতী-অষ্টম সং 'বঙ্গমাতা'/পৃ. ২৮৫
১৪. রবীন্দ্র রচনাবলী-৭/প.ব.স./ উপন্যাস গোরা/ পৃ. ৭১৫
১৫. মালিনী ভট্টাচার্য/ রবীন্দ্র চিন্তায় ও সৃষ্টিতে নারীমুক্তির ভাবনা/ অনুষ্টুপ সম্পাদনা অনিল আচার্য, সব্যসাচী দেব- ১৯৯৯-পৃ. ৫৩
১৬. M.Sarada/ Rabindranath Tagore; A study of women characters of his Novels/ sterling publishers New Delhi 1988-P-60
১৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী-৭/ প.ব .স./ উপন্যাস গোরা-৭০৫
১৮. তদেব পৃঃ ৭০৫-৬
১৯. তদেব পৃ. ৬৭১
২০. রবীন্দ্র রচনাবলী-৮/প.ব.স./উপন্যাস - ঘরে বাইরেী-পৃ- ৭
২১. রবীন্দ্র রচনাবলী-১৩/ প.ব.স./ প্রবন্ধ-কালান্তর-নারী-পৃ. ৬৭৭
২২. রবীন্দ্র রচনাবলী- ৮/প.ব.স./ উপন্যাস-ঘরে বাইরে-পৃ. ২৩
২৩. তদেব পৃ. ৫৬-৬৭
২৪. তদেব পৃ. ৬০
২৫. তদেব পৃ. ৬৩
২৬. তদেব পৃ. ৯৪
২৭. তদেব পৃ. ১২৪
২৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়/ বাংলা উপন্যসের কালান্তর/ দে'জ ১৯৮০/পৃ. ১৮৪
২৯. রবীন্দ্র রচনাবলী ৮/ প.ব.স./ উপন্যাস- চতুরঙ্গ- পৃ. ১৫০
৩০. তদেব পৃ. ১৬০
৩১. তদেব পৃ-১৬৩
৩২. তদেব পৃ-১৬৪-৬৫
৩৩. তদেব পৃ-১৭৭
৩৪. M.Sarada/ Rabindranath Tagore: A study of women characters of his Novels/ sterling publication-1988 New Delhi/ P-100
৩৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ কুমুর বন্ধন/ধানশীষ প্রকাশনী ১৯৮২ পৃ. ৩৭-৩৮
৩৬. তদেব পৃ. ৪৪-৪৫
৩৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়/ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর/ দে'জ ১৯৮০/পৃ. ১৯১
৩৮. রবীন্দ্র রচনাবলী- ৮/ প.ব.স./উপন্যাস যোগাযোগ/পৃ . ২০০

৩৯. ডঃ অমরেশ দাশ/ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ নব মূল্যায়ণ/মন্ডল বুক হাউস ১৩৯০ পৃ. ১০৮
৪০. দীনেশচন্দ্র সিংহ/ রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (রবীন্দ্রনাথের চিঠি)। শারদীয় দেশ-১৪০৪ পৃ. ৪৯
৪১. তদেব পৃ. ৪৯
৪২. তদেব পৃ. ৪৯
৪৩. তদেব পৃ. ৫০
৪৪. রবীন্দ্র রচনাবলী-৮/প.ব.স./ উপন্যাস যোগাযোগ- পৃ. ২২৩
৪৫. অশ্রুকুমার সিকদার/আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস/অরুণা প্রকাশনী ১৯৯৩/ পৃ. ১৬
৪৬. রবীন্দ্র রচনাবলী ৮/ যোগাযোগ পৃ. ২১২-১৩
৪৭. তদেব যোগাযোগ পৃ. ৩০০
৪৮. তদেব যোগাযোগ পৃ. ৩১৮
৪৯. তদেব যোগাযোগ পৃ. ৩১৮
৫০. মল্লিকা সেনগুপ্ত / রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র থেকে শিখুন/রবিবার, বর্তমান পত্রিকা ৭ আগষ্ট ১৯৯৪
৫১. রবীন্দ্ররচনাবলী- ৮/ শেষের কবিতা- পৃ. ৩৫০
৫২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়/ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর/ দে'জ ১৯৮০-পৃ. ১৯০
৫৩. রবীন্দ্ররচনাবলী ৮/ শেষের কবিতা পৃ. ৩৫৫
৫৪. তদেব ,, পৃ. ৩৯৫
৫৫. তদেব ,, পৃ. ৩৯৪
৫৬. রবীন্দ্র রচনাবলী ২১শ খন্ড গ্রন্থ পরিচয় ৫১৪-১৫
৫৭. রবীন্দ্র রচনাবলী ৯/ প.ব.স./ গল্পগুচ্ছ- ল্যাবরেটরি- পৃ. ৭৬২
৫৮. সুকুমার সেন/ সাহিত্যের ইতিহাস- ৩, রবীন্দ্রনাথ- ইস্টার্ন পাবলিশার্স- ১৯৮১। পৃ. ৪৫১
৫৯. রবীন্দ্র রচনাবলী-৮। প.ব.স.। দুইবোন - পৃ. ৪১৮
৬০. তদেব দুইবোন - পৃ. ৪১১
৬১. তদেব দুইবোন - পৃ. ৪১২
৬২. তদেব দুইবোন - পৃ. ৪১৮
৬৩. তদেব ,, - পৃ. ৪২০
৬৪. তদেব ,, - পৃ. ৪৩২
৬৫. অশ্রুকুমার সিকদার/ আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস- অরুণা প্রকাশনী- ১৩৯৫/পৃ. ১৯
৬৬. রবীন্দ্র রচনাবলা -৮/ চার অধ্যায়/ পৃ. ৪৭১
৬৭. তদেব ,, পৃ. ৪৭২
৬৮. তদেব ,, পৃ. ৪৭২
৬৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দে'জ ১৯৮০ পৃ. ১৯১-৯২
৭০. রবীন্দ্র রচনাবলী ৮/ চার অধ্যায় - পৃ. ৪৭৮
৭১. তদেব ,, পৃ. ৪৯২
৭২. তদেব ,, পৃ. ৪৯২